বাংলা

বিজ্ঞান কথা

Vol. II | Issue 3

মার্চ ২০২৪

হে ভারত ভুলিও না

স্বামীজী যে বিরাট সম্ভাবনার বীজ বপন করেছিলেন সেই চেতনার স্পন্দন তিনি প্রবাহিত করেন তাঁর অনুগামী ও অনুরাগীদের মধ্যে। ফলতঃ এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে জামশেদজিকে পূর্ণ সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন ভগিনী নিবেদিতা।

- মাংসাশী ছত্রাক
- আন্তর্জাতিক বন্যপ্রাণী দিবস
- ক্ষতিগ্রস্ত জিনের মেরামতি
- মহাকাশে অপত্য পুরাণ
- যারা আলো জ্বেলেছিল

Shanti Foundation

RAMAKRISHNA MISSION

সূচীপত্র

বিজ্ঞান সংবাদ ৪

হে ভারত ভুলিও না ৬
নকুল পারাশর

মাংসাশী ছত্রাক ১০
অসিত বরণ দে

আন্তর্জাতিক বন্যপ্রাণী দিবস ১২
অমর কুমার নায়ক

ক্ষতিগ্রস্ত জিনের মেরামতি ১৪
সিদ্ধার্থ রায়

ভেষজ উদ্ভিদ গবেষণা ও চিকিৎসা জগতে নতুন দিগন্ত—একটি গবেষণাপত্র ১৭
রণিতা দত্ত, শিঞ্জিনী মিত্র ও এণা রায় ব্যানার্জী

মহাকাশে অপত্য পুরাণ ১৯
তুহিন সাজ্জাদ সেখ

যারা আলো জ্বেলেছিল ২২
অরুণাভ দত্ত

জিরিয়া পাখি ২৬
তাপস কুমার দত্ত

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জগতের মার্চ মাসের কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ২৮

মার্চে জন্মগ্রহণ করেছেন যে বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা ৩০

গ্রন্থ সমালোচনা ৩২

সম্পাদক সমীপেষু

প্রিয় সম্পাদক,

বিজ্ঞান কথা-র সব সংখ্যাগুলো প্রকাশিত হলেই খুব আগ্রহের সাথে পড়ি। উপস্থাপনা ও বিষয়-বৈচিত্রের জন্যই পত্রিকাটি এত ভালো লাগে। সবথেকে ভালো লাগে সহজ-সরল ভাবে লেখা বিজ্ঞানের অনেক জটিল তত্ত্ব বা ঘটনা। ব্যাপারগুলো বুঝতে খুব সুবিধা হয়। আরো সুবিধা হয় অন্যকে বোঝাতে। সহজ ভাষায় বিজ্ঞানকে এইভাবেই সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব।

এই পত্রিকা সম্পর্কে আমি কিছু কথা জানাতে চাই—

যদিও এই পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় নানা বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, বিজ্ঞানের আরো অনেক বিষয় আছে যেগুলো আজকের দিনে ইন্টারনেট খুললেই দেখা যায় বা সেগুলির সম্পর্কে ভাসা-ভাসা কিছু কথাও জানতে পারা যায়। এই তথ্য যারা বিজ্ঞানের ছাত্র নয় তাদের জন্য হয়তো যথেষ্ট সহজবোদ্ধ হয় না। যেমন ধরা যাক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা chatGPT। এই সম্পর্কে কিছু প্রবন্ধ প্রকাশ করলে ভালো হয়।

যদিও পত্রিকাটি ইলেকট্রনিক ফরম্যাটে আমাদের কাছে আসে, এর কিছু কপি কি প্রিন্ট করে গ্রামের স্কুলের ছাত্রদের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব?

স্কুল পড়ুয়াদের জন্য কিছু পাঠ্য বিষয় এর মধ্যে রাখলে খুব ভালো হয়। অনুভবী শিক্ষকরা যদি পাঠ্য বিষয়গুলো সহজ ও আকর্ষণীয় করে লেখেন, পড়ুয়াদের ওই বিষয়গুলোর ওপর ভয় কেটে যাবে ও তারা ওগুলো পড়তে উৎসাহ পাবে।

অবশ্যই, বাংলা বানানের প্রতি আরো সতর্ক হতে হবে।

পত্রিকাটির আরো বেশি প্রচার ও প্রসার হোক, এই কামনা করি।

পূজা ব্যানার্জী
(pooja.banerjee.2014@gmail.com)

সম্পাদকীয়

বিজ্ঞানে নারীর ক্ষমতায়ন

বসন্তের সমাগমে আকাশে বাতাসে প্রাণবন্ত রঙের খেলা আমাদের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে। রঙের উৎসবের প্রাক্কালে দাঁড়িয়ে আসুন, আমরা স্মরণ করি ভারতীয় মহিলা বিজ্ঞানীদের মহান অবদানকে।

বিজ্ঞানে মহিলাদের অবদানের সমৃদ্ধ প্রক্ষাপটে ভারতীয় মহিলা বিজ্ঞানীদের ভূমিকা, সহনশীলতা, মেধা এবং অধ্যবসায় দৃষ্টান্তস্বরূপ। প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ভারতীয় মহিলারা বৈজ্ঞানিকরা জ্ঞানের অগ্রগতি এবং উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা, জন্মসূত্রে যাঁর নাম ছিল মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল, ছিলেন পরাধীন ভারতে শিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়নের জন্য উৎসর্গীকৃতপ্রাণ। তৎকালীন সামাজিক সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে তিনি নারী শিক্ষার প্রসার ঘটান এবং অল্পবয়সী মেয়েদের আত্মপ্রত্যয় এবং সামাজিক অগ্রগতির উপায় হিসাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে উৎসাহিত করেন।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রথম নারী মহাকাশচারী হিসেবে ডক্টর কল্পনা চাওলার সাহস ও দৃঢ়তা লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে। একজন মহাকাশচারী হিসাবে তার সাফল্য ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে অদম্য চেতনার বিকাশ ঘটিয়াছে এবং আক্ষরিক অর্থেই আকাশ ছোঁয়ার কল্পনাকে বাস্তবায়িত করেছে। কলম্বিয়া মহাকাশযান বিপর্যয়ে ডঃ চাওলার মর্মান্তিক অকালমৃত্যু বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের অন্তর্নিহিত ঝুঁকি এবং ত্যাগের প্রতীক।

অগ্রগামী প্রকৌশলী এবং পদার্থবিদ ডঃ রাজেশ্বরী চ্যাটার্জি মাইক্রোওয়েভ ইঞ্জিনিয়ারিং এবং রাডার প্রযুক্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। কর্ণাটকের প্রথম মহিলা প্রকৌশলী হিসাবে ডক্টর চ্যাটার্জি ভবিষ্যত প্রজন্মের মহিলাদের জন্য সমস্ত সামাজিক বাধা ভেঙে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার পথ তৈরি করেছিলেন। ডঃ অসীমা চ্যাটার্জি ছিলেন একজন বিখ্যাত জৈব রসায়নবিদ এবং প্রাকৃতিক পণ্য রসায়নের ক্ষেত্রে পথিকৃৎ। উদ্ভিদ অ্যালকালয়েড এবং ঔষধি যৌগের উপর তার যুগান্তকারী গবেষণা ভেষজ শিল্পে নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করেছে। ডক্টর চ্যাটার্জি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তার কাজের জন্য মর্যাদাপূর্ণ শান্তি স্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার সহ অসংখ্য পুরস্কারে ভূষিত হন। ডক্টর কমলা সোহনি ছিলেন বিজ্ঞানে পিএইচডি প্রাপ্ত প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি জৈব রসায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। লেগুমের পুষ্টির বৈশিষ্ট্য এবং বিপাক ক্রিয়ায় উৎসেচকের ভূমিকা নিয়ে তার অগ্রণী গবেষণা কৃষি বিজ্ঞান এবং মানব পুষ্টির অগ্রগতির ভিত্তি স্থাপন করেছে।

ডঃ জানকী আম্মাল ছিলেন একজন অগ্রগামী উদ্ভিদবিদ এবং সাইটোজেনেটিসিস্ট যিনি উদ্ভিদ জেনেটিক্স এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। আখ এবং অন্যান্য ফসলের উদ্ভিদের সাইটোজেনেটিক্স নিয়ে তার গবেষণা কৃষি পদ্ধতি এবং শস্য প্রজনন কৌশলে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। সমসাময়িক অগ্রদূতদের তালিকায় আছেন গগনদীপ কাং, রোহিনী গডবোলে এবং সৌম্যা স্বামীনাথনের মতো ব্যক্তিত্বরা, যাদের কাজের দৃষ্টান্ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে একটি স্থায়ী দাগ রেখে গেছে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রাক্কালে এই অসাধারণ নারী বিজ্ঞানীদের শ্রদ্ধা জানবার সাথে সাথে আসুন আমরা বিজ্ঞানমনস্কতা ও বিজ্ঞান-চেতনার সংস্কৃতি গড়ে তোলার প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি পালনে দৃঢ়-সংকল্প হই। জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পালনের সার্থকতা প্রতিফলিত হোক নিয়মিতভাবে বিজ্ঞান সংযোগের মহান কাজটি চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে। আসুন, আমরা নিশ্চিত করি যে সমাজের প্রতিটি কোণায় যেন বিজ্ঞানমনস্কতা পৌঁছে যায় এবং ভবিষ্যতের প্রজন্মের বিজ্ঞানী ও উদ্ভাবকদের অনুপ্রাণিত করে।

আসুন, আমরা ভারতীয় মহিলা বিজ্ঞানীদের যুগান্তকারী অনুসন্ধান, আবিষ্কার এবং উদ্ভাবনের গৌরবে উদ্দীপ্ত হই। এঁদের অবদান আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করুক এবং জ্ঞান ও চেতনার নতুন উচ্চতায় পৌঁছতে আমাদের অনুপ্রাণিত করুক। সকলকে জানাই দোলযাত্রার আন্তরিক শুভেচ্ছা, এই উৎসবের রঙ বিজ্ঞান ও সমাজের জন্য একটি উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতিশীল ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর আমাদের হৃদয় ও মনকে উজ্জ্বল করে তুলুক।

ডঃ নকুল পারাশর

বাংলা বিজ্ঞান কথা

March 2024 | Vol. II | Issue 3

উপদেষ্টামণ্ডলী

স্বামী কমলাস্থানন্দ
প্রোঃ বিমল রায়
প্রোঃ অনুপম বসু
ডঃ সুমিত্রা চৌধুরী
প্রোঃ শুভব্রত রায়চৌধুরী

মুখ্য সম্পাদক

ডঃ নকুল পারাশর

সম্পাদকমণ্ডলী

ডঃ ভূপাতি চক্রবর্তী
প্রোঃ সিদ্ধার্থ জোয়ারদার
প্রোঃ শঙ্করাশিস মুখার্জি
অমিতেশ ব্যানার্জী

যোগাযোগের ঠিকানা

রামকৃষ্ণ মিশন
বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজ
রহড়া, কলকাতা 700118

শান্তি ফাউন্ডেশন
ইউ জি 17, জ্যোতি শিখর
ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, জনকপুরী
নয়া দিল্লী 110060

ফোন
+91 11 4036 5723

ইমেল
info@shantifoundation.global

ওয়েবসাইট
www.shantifoundation.global

'বাংলা বিজ্ঞান কথা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধ, মতামত বা লেখকের ব্যবহৃত চিত্রের বিষয়ে প্রকাশকের কোনো দায়বদ্ধতা থাকবে না।

'বাংলা বিজ্ঞান কথা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি কেবলমাত্র বিনামূল্যে বিতরিত কোনো মুদ্রণ মাধ্যমেই প্রকাশকের অগ্রিম অনুমতির ভিত্তিতে উপযুক্ত সূত্রমূলের উল্লেখসাপেক্ষে পুনর্মুদ্রণযোগ্য।

প্রকাশক

রামকৃষ্ণ মিশন
বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজ
রহড়া, কলকাতা 700118

এবং

শান্তি ফাউন্ডেশন
ইউ জি ১৭, জ্যোতি শিখর
ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, জনকপুরী
নয়া দিল্লী ১১০০৬০

Shanti Foundation

বিজ্ঞান সংবাদ

ওজন কমানোর ওষুধ মৃত্যুর কারণ হতে পারে

বিখ্যাত উদ্যোগপতি ইলন মাস্ক কীভাবে সেমাগ্লুটাইড ব্যবহার করে প্রায় 10 কেজি ওজন কমিয়ে সে সম্পর্কে পোস্ট করার পরে ড্রাগটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই ওষুধটি গ্লুকাগন-লাইক পেপটাইড-1 (GLP-1) অ্যাগোনিস্ট নামক এক ধরণের ওষুধ যা পরিপূর্ণ ভোজনের আগেই মস্তিষ্কে সংকেত পাঠায় যে দেহের খাদ্যগ্রহন সম্পূর্ণ হয়েছে। GLP-1 একটি হরমোন যা ক্ষুদ্রান্তে উৎপাদিত হয়। এটি ইনসুলিন নিঃসরণকে উদ্দীপিত করে এবং গ্লুকাগন নিঃসরণকে বাধা দিয়ে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। GLP-1 পরিপাক ক্রিয়াকেও মন্থর করে, যার ফলে খাদ্য থেকে কম গ্লুকোজ রক্তে নির্গত হয়। কিন্তু ওষুধ হিসাবে গ্রহণ করলে এর সাধারণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হল বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া এবং ডায়রিয়া। ওষুধটি কিছু ক্ষেত্রে ইলিয়াস নামক একটি বিরল জটিলতা সৃষ্টি করে যা এক অর্থে অন্ত্রের পক্ষাঘাত। এর ফলে তার মলত্যাগ এবং প্রস্রাব প্রক্রিয়া বন্ধ করে তার শরীরে বর্জ্য জমা হয়, ফলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। সাধারণত ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে এই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ঘটে না, কিন্তু বিনা ডায়াবেটিসে শুধুমাত্র ওজন কমাবার জন্য এইধরণের ওধুধ গ্রহণে এই সমস্যার সম্ভাবনা থাকে। মনে রাখতে হবে, GLP-1 অ্যাগোনিস্টগুলি ওজন কমানোর ওষুধ হিসাবে তৈরি করা হয়নি, এগুলি ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। সুতরাং, প্রথমবার GLP-1 অ্যাগোনিস্ট ব্যবহার করার সময় চিকিৎসক এবং রোগী উভয়কেই বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে। যদি কোনও রোগীর বডি মাস ইনডেক্স 30-এর বেশি থাকে তবে ওষুধটি ব্যবহার করার কোনও ক্ষতি নেই। কিন্তু 28-এর কম BMI সহ অ-ডায়াবেটিক রোগীর জন্য এই ওষুধটি মোটেই নিরাপদ নয়। এই ওষুধের ব্যবহার ওজন হ্রাস উচ্চ রক্তচাপ এবং কার্ডিওভাসকুলার রোগের ঝুঁকি অনেকাংশে কমাতে পারে। তবুও ওজন কমাবার উপায় হিসাবে এর ব্যবহার যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ। বিকল্প হিসাবে সর্বদা স্বাস্থ্যকর খাওয়া এবং ব্যায়ামের মাধ্যমে সর্বোত্তম ওজন বজায় রাখার চেষ্টা করা উচিত।

ক্লাউনফিশের গণনার ক্ষমতা

একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে স্বতন্ত্র সাদা ডোরাগুলির জন্য পরিচিত ক্লাউনফিশ (*Amphiprion ocellaris*) নিজের গোষ্ঠীর অন্য মাছেদের চিনতে প্রাথমিক গণনা পদ্ধতি ব্যবহার করে। *জার্নাল অফ এক্সপেরিমেন্টাল বায়োলজিতে* প্রকাশিত গবেষণায় দেখা গেছে যে ক্লাউনফিশ অন্যান্য মাছের উপর তিনটি দাগ গণনা করার মাধ্যমে বন্ধু ও শত্রু সনাক্ত করতে পারে এবং এই দক্ষতা ব্যবহার করে সম্ভাব্য বিপদ থাকে নিজেকে রক্ষা করে। নিজস্ব গোষ্ঠীর মধ্যে নিরাপত্তা খুঁজে পেতে বা বেশি পরিমানে খাদ্যের সন্ধান করতে প্রাণীজগতে এই ধরণের গণনার দক্ষতার বিভিন্ন সুবিধা রয়েছে বলে মনে করা হয়। ক্লাউনফিশের ক্ষেত্রে তাদের দেহের স্ট্রাইপ বা সাদা দাগ গণনা করার ক্ষমতা তাদের নিজস্ব প্রজাতির সদস্যদের সনাক্তকরণ এবং সম্ভাব্য অনুপ্রবেশকারীদের থেকে তাদের আলাদা করার উদ্দেশ্যে কাজ করে। ক্লাউনফিশের গণনার ক্ষমতা সংক্রান্ত গবেষণায় বিভিন্ন স্ট্রাইপ প্যাটার্ন সহ অনেকগুলি ক্লাউনফিশের প্রত্যেকটিকে একটি জলাধারের মধ্যে পৃথক পৃথক স্বচ্ছ বাক্সের ভিতরে রাখা হয়েছিল।দেখা গেছে যে ক্লাউনফিশগুলি নিজেদের মতো একই সংখ্যক স্ট্রাইপ সহ প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে অনেক বেশি তৎপর। বিজ্ঞানীরা ক্লাউনফিশের আচরণে স্ট্রাইপের ভূমিকা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আগ্রহী। এই গবেষণার পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী ক্লাউনফিশ স্ট্রাইপ প্যাটার্নের প্রতি গভীর মনোযোগ দেয় এবং একই ধরণের স্ট্রাইপযুক্ত ও পৃথক স্ট্রাইপযুক্ত মাছেদের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার প্রমান করে করে যে ক্লাউনফিশ আসলে স্ট্রাইপগুলি গণনা করতে পারে এবং সম্ভাব্য বিপদ সনাক্ত করতে এই তথ্য ব্যবহার করতে পারে। তবে এই গবেষণার ফলাফল নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে এখনো মতভেদ রয়েছে।

উন্নত আবহাওয়া পর্যবেক্ষক উপগ্রহ উৎক্ষেপণের লক্ষ্যে ইসরো

ISRO তার তৃতীয় প্রজন্মের আবহাওয়া পর্যবেক্ষক উপগ্রহ INSAT-3DS-কে শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার (SDSC)-এ GSLV F14-এ যাত্রা শুরু করলো 17ই ফেব্রুয়ারি 2024 বিকাল 5:35-এ। ইতিপূর্বে বেঙ্গালুরুর ইউ আর রাও স্যাটেলাইট সেন্টার সফলভাবে স্যাটেলাইটটির সমাবেশ, একীকরণ এবং পরীক্ষার কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। স্যাটেলাইটটি ভারত সরকারের ভূবিজ্ঞান মন্ত্রকের (MoES) আর্থিক সহায়তায় নির্মিত, এবং ISRO-এর I-2k বাস প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে গড়ে তোলা হয়েছে। এর ভর 2275 কেজি। স্যাটেলাইটটি তৈরিতে ভারতীয় শিল্পমহল উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। ISRO-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে INSAT-3DS একটি সম্পূর্ণ আবহাওয়া পর্যবেক্ষক উপগ্রহ এবং এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য বিদ্যমান INSAT-3D ও 3DR স্যাটেলাইটগুলিতে পরিষেবার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং উল্লেখযোগ্যভাবে INSAT সিস্টেমের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। উপগ্রহটি ডাটা রিলে ট্রান্সপন্ডার, অ্যাডভান্সড এডেড সার্চ এন্ড রেসকিউ, 6 চ্যানেল ইমেজার এবং 19 চ্যানেল সাউন্ডার পেলোড বিশিষ্ট। ISRO-এর মতে, স্যাটেলাইটটি উন্নত আবহাওয়া সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ এবং আবহাওয়ার পূর্বাভাস এবং দুর্যোগ সতর্কতার জন্য ভূমি ও সমুদ্রের পৃষ্ঠতলের নিরীক্ষণের জন্য ডিজাইন করা ও অত্যাধুনিক পেলোড সংযুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে উপস্থিত ডিআরটি যন্ত্রটি স্বয়ংক্রিয় ডেটা সংগ্রহ প্ল্যাটফর্ম বা স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া স্টেশন (AWS) থেকে আবহাওয়া সংক্রান্ত, হাইড্রোলজিক্যাল এবং সমুদ্র সংক্রান্ত তথ্য গ্রহণ করবে এবং আবহাওয়ার সঠিক পূর্বাভাস করতে পারবে।

আলঝেইমার জনিত স্মৃতি সমস্যা সমাধানে নতুন উপায়

একটি সাম্প্রতিক গবেষণায়, গবেষকরা আলঝেইমার এবং সম্পর্কিত স্মৃতিভ্রংশের মতো সমস্যাগুলিকে মোকাবেলার জন্য একটি বিকল্প কৌশল প্রস্তাব করছেন। বাক ইনস্টিটিউট ফর রিসার্চ অন এজিং-এর গবেষকদের মতে, আলঝেইমার চিকিৎসা সংক্রান্ত বেশিরভাগ আধুনিক গবেষণা রোগের বিস্তার রোধে মস্তিষ্কে জমা হওয়া বিষাক্ত প্রোটিনের পরিমান হ্রাস করার উপর গুরুত্ব দেয়। সম্প্রতি *দ্য জার্নাল অফ ক্লিনিক্যাল ইনভেস্টিগেশনে* প্রকাশিত গবেষণাপত্রে গবেষকরা বলেছেন যে স্মৃতিশক্তি পুনরুদ্ধার করার জন্য মস্তিষ্কে বিষাক্ত প্রোটিনের পরিমান কমানোর চেষ্টা করার পরিবর্তে আলঝেইমার রোগের কারণে সৃষ্ট ক্ষতিকে পূরণ করার চেষ্টা করা যেতে পারে। এই নতুন কাজের সহায়ক হবে KIBRA নামক একটি প্রোটিন, যা কিডনি এবং মস্তিষ্কে পাওয়া যায়। মানুষের মস্তিষ্কে এটি প্রধানত সাইন্যাপসে পাওয়া যায়, যা শুধুমাত্র নিউরনের মধ্যে সংযোগ হিসাবে কাজ করে না, স্মৃতি গঠন ও রোমন্থন করতেও সাহায্য করে। অতীতের গবেষণায় দেখা গেছে যে স্মৃতি গঠনের জন্য সাইন্যাপসের KIBRA প্রয়োজন এবং বর্তমান গবেষণাটি বলছে যে আলঝেইমার আক্রান্ত ব্যক্তির মস্তিষ্কে KIBRA-এর ঘাটতি রয়েছে। কিভাবে KIBRA-এর স্বল্পতা সাইন্যাপসে সংকেতকে প্রভাবিত করে সেই প্রক্রিয়াটি আরও ভালভাবে বোঝা এবং আলঝেইমার রোগের সময় ক্ষতিগ্রস্থ সাইন্যাপসগুলি কীভাবে মেরামত করা যায়, সেটাই ছিল এই গবেষণার লক্ষ্য। গবেষকরা বর্তমানে এই কাজের উপর ভিত্তি করে একটি থেরাপি তৈরি করার চেষ্টা করছেন। দেখা গেছে, সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইডে KIBRA-র উচ্চ মাত্রা এবং মস্তিষ্কে নিম্ন মাত্রা স্মৃতিহীনতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। সাইন্যাপ্সে KIBRA-র প্রভাব খুঁজে বের করার জন্য গবেষকরা ওই প্রোটিনের একটি সংক্ষিপ্ত কার্যকরী সংস্করণ তৈরি করেন। আলঝেইমার রোগের উপসর্গ বিশিষ্ট একটি ইঁদুরের উপর ওই প্রোটিন পরীক্ষা করার পরে তারা দেখেছে যে প্রোটিনটি সেই ধরণের স্মৃতিভ্রংশ অবস্থা ও স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করে। KIBRA সম্ভবত সাইন্যাপসের স্থিতিস্থাপকতাকে বৃদ্ধি করার প্রক্রিয়ায় এই কাজ করে। গবেষকদের মতে আলঝেইমার রোগ শুরু হওয়ার পরে স্মৃতিশক্তি উন্নত করার জন্য চিকিৎসা হিসাবে KIBRA ব্যবহার করা যেতে পারে। এমনকি যদি মস্তিষ্কে বিষাক্ত প্রোটিন উপস্থিত থাকে, তাহলেও এই চিকিৎসা পদ্ধতি কার্যকর।

হে ভারত ভুলিও না

নকুল পারাশর

1893 সালে একটি জাহাজে জাপানের ইয়োকোহামা থেকে কানাডার ভ্যাঙ্কুভার পর্যন্ত সফর করছেন দুই ভারতীয়। তাদের একজন 30 বছরের যুবক এক অখ্যাত সন্ন্যাসী এবং অন্যজন অত্যন্ত সফল ব্যবসায়ী-শিল্পপতি। ভারতে শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনায় সন্ন্যাসী তার সঙ্গী শিল্পপতিকে কেবল কাঁচামাল বা অর্ধ-সমাপ্ত পণ্য নিয়ে ব্যবসা করার পরিবর্তে পূর্ণ উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ও দেশের লোকেদের জন্য ব্যাপক কর্মসংস্থান তৈরী করতে শিল্পক্ষেত্রে এই পরিবর্তন ছিল অপরিহার্য। তিনি আরো বলেন, ভারতীয়দের শুধু বিজ্ঞানে নয়, প্রযুক্তিতেও প্রশিক্ষণ দেওয়া অত্যন্ত জরুরি, যাতে দেশের প্রয়োজনীয়তার অধিকাংশ ভাগ অভ্যন্তরীণ উৎপাদন দ্বারা পূরণ করা যায়। দুই সহযাত্রীই জানতেন যে পরাধীন দেশে এই কাজ সহজ হবে না। তবুও সন্ন্যাসীর যুক্তিপূর্ণ কথায় শিল্পপতি যথেষ্ট প্রভাবিত হন। বহুল-চর্চিত এই আলোচনায় অংশগ্রহণকারী দুই ভারতীয়ের পরিচয় আমাদের প্রায় সকলেরই জানা, একজন স্বামী বিবেকানন্দ আর অন্যজন জামশেদজি টাটা।

এই ঘটনার চার বছর পর স্বামীজী দেশে ফেরেন। তাঁর দেশে ফেরার পর রামকৃষ্ণ মিশন তৈরির ব্যস্ততায় কেটে যায় আরও একটি বছর। 1889 এর নভেম্বরে হঠাৎই স্বামীজীকে চিঠি

আলমোড়ায় স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা

লিখে জামশেদজি তাঁর প্রস্তাবিত আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পঠন-পাঠন ও গবেষণাকেন্দ্র গড়ে তোলার কথা জানান এবং দেশব্যাপী এর প্রচারের দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করেন। ভগ্ন-স্বাস্থ্য ও নিজের পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা রূপায়ণে ব্যস্ত স্বামীজীর পক্ষে এই দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব হয় নি। কিন্তু পাঁচ বছর আগে স্বামীজী যে বিরাট সম্ভাবনার বীজ বপন করেছিলেন সেই চেতনার স্পন্দন তিনি প্রবাহিত করেন তাঁর অনুগামী ও অনুরাগীদের মধ্যে। ফলতঃ এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে জামশেদজিকে পূর্ণ সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন ভগিনী নিবেদিতা।

ভগিনী নিবেদিতার জন্ম আয়ারল্যান্ডে 1867 সালের 28 অক্টোবর। জীবনের প্রথম ভাগে তাঁর নাম ছিল মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল। তার শৈশব এবং প্রথম যৌবনের দিনগুলি কাটে আয়ারল্যান্ডে। তিনি 1895 সালে লন্ডনে স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাত পান এবং 1898 সালে কলকাতায়

নিবেদিতা স্থাপিত প্রথম মহিলা বিদ্যালয়

আসেন। ওই বছর 25 মার্চ তারিখে স্বামীজীর কাছে ব্রহ্মচর্যের ব্রত গ্রহণ করার সময় তাঁর নামকরণ হয় নিবেদিতা। এক ব্রিটিশ উপনিবেশ পরাধীন আয়ারল্যান্ড থেকে অপর এক ব্রিটিশ উপনিবেশ ভারতে এসে তিনি তাঁর জন্মভূমি ও ভারতের মধ্যে এক অনন্য মিল খুঁজে পান। ক্রমে তাঁর নতুন কর্মভূমি তাঁর চিন্তা-চেতনার কেন্দ্র হয়ে পরে। পরাধীন ভারতের জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা তাঁর কোমল মনকে অধিকার করে। নিবেদিতা তাঁর সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেন ভারতের উন্নতি ও প্রগতিতে। শিক্ষার, বিশেষত স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারে ভগিনী নিবেদিতার ভূমিকা সর্বত্র শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়। কিন্তু ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসারে তাঁর ভূমিকার কথা সেভাবে আলোচিত নয়। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমরা ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতিতে এই মহীয়সীর অবদান সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি।

বৈজ্ঞানিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ নিবেদিতার মনে হয়েছিল কোনো জাতির সার্বিক উন্নয়নের প্রাথমিক শর্ত হল সুসংগঠিত শিক্ষা পরিকাঠামো। আবার শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাথমিকতা দেওয়া উচিত স্ত্রী-শিক্ষাকে। নিবেদিতা নিজেকে নিয়োজিত করলেন কলকাতায় স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারে। 1898 সালের নভেম্বর মাসে তিনি উত্তর কলকাতার বাগবাজার এলাকায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনা করেন। ইতিমধ্যে 1899 সালে কলকাতাকে গ্রাস করে ভয়ঙ্কর প্লেগ মহামারী। এইসময় দরিদ্র রোগীদের সেবা ও যত্ন নেবার সাথে সাথে জন-স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রচারে উদ্যোগী হন নিবেদিতা।

ফিরে আসি জামশেদজির প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠান তৈরির কথায়। এই প্রতিষ্ঠানের জন্য জামশেদজি 30 লক্ষ টাকা ধার্য করেছিলেন। জামশেদজির চিন্তায় বিজ্ঞান মানে ছিল বিশেষ জ্ঞান, যা শুধুমাত্র পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত বা জীববিদ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাই তিনি এই প্রতিষ্ঠানে পারম্পরিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়গুলিও রাখতে চেয়েছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের অনুমতি পাবার জন্য তিনি তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড কার্জনের সাথে দেখা করেন। ভাইসরয় ধারণাটিকে অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেন। তিনি মনে করেছিলেন যে ভারতীয়দের বিজ্ঞানের গবেষণায় জড়িত থাকার যোগ্যতা নেই, সুতরাং এই প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট যোগ্য গবেষক পাবে না এবং এই ধরনের প্রশিক্ষণের পরে ছাত্রদের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা সম্পর্কেও তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছিল।

ভাইসরয়ের জামশেদজির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের পর ভগিনী নিবেদিতা এই মহান দেশপ্রেমিক-শিল্পপতির এই পরিকল্পনার বাস্তবায়িত করার জন্য সক্রিয়ভাবে প্রচার শুরু করেন। এটিকে সফল করার জন্য তিনি ইংরেজী গণমাধ্যমে বেশ কয়েকটি নিবন্ধ লেখেন। 1899 সালের প্রথম দিকে তিনি লিখেছিলেন, “We are not aware if any project is at once so opportune and so far-reaching in its beneficent effects was ever mooted in India, as that of the Post-Graduate Research University of Mr Tata. The scheme grasps the vital point of weakness in our national well-being with a clearness of vision and tightness of grip, the masterliness which is only equalled by the munificence of the gift with which it is ushered to the public.”

জামশেদজি টাটা

শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার 1900 সালে স্যার উইলিয়াম রামসে-এর অপর এই প্রস্তাবের বাস্তবতা নিরুপনের ভার দেয়। রামসে সেসময় একজন সুপরিচিত বিজ্ঞানী। 1904 সালে নিষ্ক্রিয় গ্যাস আবিষ্কারের জন্য তিনি রসায়নে নোবেল পুরষ্কার পান এবং তার আবিষ্কারের ফলে পর্যায় সারণীতে একটি নতুন কলাম যুক্ত হয়। বিজ্ঞানী হিসেবে প্রতিভাশালী হলেও রামসে ঔপনিবেশিক সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি। তিনি সরাসরি প্রস্তাবটি নাকচ করে দেন। তার পর্যবেক্ষণগুলির মধ্যে একটি ছিল, এমন কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠা বাস্তবে কোনোভাবেই সম্ভব নয় যা টাটা প্রস্তাবিত পথে চলে অন্যান্য কলা বিভাগের বিষয়গুলির সাথে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সমন্বয়ে ঘটাবে। ভাইসরয় এবং অন্য বহু ব্রিটিশ আধিকারিকের পরামর্শ ছিল যে টাটা প্রতিষ্ঠানটি তৈরি করুন এবং তাঁর পরিচালনার ভার সরকারের ওপর ছেড়ে দিন। টাটা তাতে একেবারেই রাজি ছিলেন না, কারণ

টাটা ইনস্টিটিউট (ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স, ব্যাঙ্গালোর)

তাঁর মূল উদ্দেশ্য দেশের মঙ্গলসাধন ও ভবিষ্যতের বুনিয়াদকে দৃঢ় করা যা ব্রিটিশ পরিচালনায় কোনোদিনও সম্ভব নয়। ফলে বিষয়টি কিছুকালের জন্য স্থগিত হয়ে যায়।

1901 সালে নিবেদিতা যখন লন্ডনে ছিলেন, তিনি শিক্ষা বিভাগের একজন বিশিষ্ট কর্মকর্তা স্যার জর্জ বিরউডের সাথেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। বিজ্ঞান ও গবেষণায় ভারতের স্বনির্ভরতার পথ উন্মুক্ত করার বিষয়ে বিরউডও উপনিবেশিক মনোভাবের বাইরে বেরোতে পারেন নি এবং তার কথাবার্তায় তার ইচ্ছার অভাবের স্পষ্ট প্রতিফলন ছিল। স্যার বিরউড টাটার প্রস্তাবে পক্ষপাতিত্বের আভাস পান। তার মতে তিনটি প্রেসিডেন্সি শহরের তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় 1857 সাল থেকে কোনো মৌলিক ভাবনার প্রতিফলন দেখতে পারে নি। তার এই মন্তব্য নিবেদিতাকে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল।

ব্রিটিশ অসহযোগিতায় ক্ষুব্ধ নিবেদিতা এই বিষয়ে একটি বৃহত্তর জনমত গড়ে তোলার কথা ভাবেন। তিনি বেশ কয়েকজন তৎকালীন নেতৃস্থানীয় বিশ্ব-চিন্তাবিদদের কাছে চিঠি লিখে এই ধরণের প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার কথা আলোচনা করেন। এঁদের অনেকের সাথে তিনি ব্যক্তিগতভাবেও যোগাযোগ করেছিলেন এবং এই ধরনের একটি প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁদের নিজস্ব মতামত প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ জানান। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সেই সময়ের শীর্ষস্থানীয় আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী এবং দার্শনিক হার্ভার্ডের উইলিয়াম জেমস, যিনি ছিলেন বিবেকানন্দের একজন বিশেষ গুণগ্রাহী। উইলিয়াম জেমস লিখেছেন, "ভারতে উচ্চ শিক্ষার প্রসারের জন্য মিঃ টাটার পরিকল্পনার বিষয়ে, আমি মনে করি যে এটি অত্যন্ত সময়োচিত উদ্যোগ .... এর ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণরূপে জাতীয় পন্থায় পরিচালিত হওয়া উচিত।" তিনি এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালন সমিতিতে ভারতের সকল সম্প্রদায়ের সমান প্রতিনিধিত্ব এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত পরিচালন ব্যবস্থা গড়ে তোলারও পরামর্শ দেন।

এই সময় তিনি পাশে পেয়েছিলেন গত কয়েক শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ স্কটিশ বুদ্ধিজীবী, জীববিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, পরিবেশবাদী এবং শহর পরিকল্পনাকারী বহুমুখী প্রতিভা প্যাট্রিক গেডেসকে। প্যাট্রিক গেডেস প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। জামশেদজির মৃত্যু হয় 1904 সালে। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান দিনের আলোর মুখ দেখতে পারে নি। ইতিমধ্যে লর্ড মিন্টো ভাইসরয় হিসেবে লর্ড কার্জনের স্থলাভিষিক্ত হন। অবশেষে 1909 সালে লর্ড মিন্টো এই প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন দেন। যদিও ইনস্টিটিউটের জন্য টাটার পছন্দ ছিল তার নিজের শহর বোম্বে (বর্তমান মুম্বাই), কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এটি ব্যাঙ্গালোরে স্থাপন করা হয়েছিল। মহীশূররাজ মহারাজা কৃষ্ণরাজ ওয়াদিয়ার এর জন্য 370 একর জমি দেন করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে মহারাজার পিতা ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের একনিষ্ঠ শিষ্য এবং তাঁকে পশ্চিমে পাঠানোর ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

প্রাথমিকভাবে টাটা ইনস্টিটিউট নামে পরিচিত এই প্রতিষ্ঠান ক্রমে দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার অগ্রগণ্য হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে এর নাম হয় ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সেস, ব্যাঙ্গালোর। যদিও এই প্রতিষ্ঠানের গড়ে ওঠার পিছনে বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণার কথা জনসাধারণের মধ্যে সেইভাবে

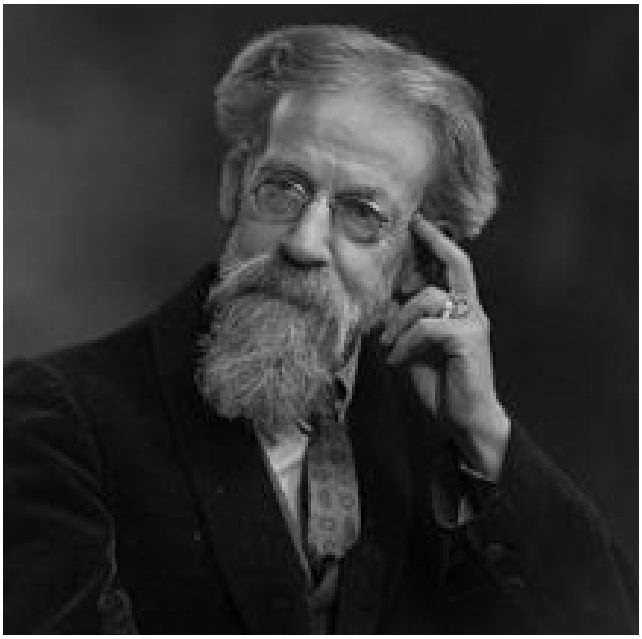

স্যার প্যাট্রিক গেডেস

পরিচিতিলাভ করে নি, দুর্ভাগ্যজনকভাবে ভগিনী নিবেদিতার অবদান প্রায় সম্পূর্ণরূপেই বিস্মৃত।

আধুনিক ভারতের অন্যতম সেরা বিজ্ঞানী স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুর প্রেরণা ছিলেন নিবেদিতা। নিবেদিতা বছরের পর বছর ধরে তাঁর সমস্ত গবেষণাকাজের জন্য আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করার পাশাপাশি তাঁকে সর্বদাই অনুপ্রাণিত করেছেন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দেশের নাম বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার জন্য। ভারতীয় মৌলিক চিন্তা-ভাবনার বিকাশ সম্পর্কে বিরউডের কটূক্তির কথা তাঁর মাথায় ছিল। তিনি তাই জগদীশ চন্দ্রকে চিনতে ভুল করেন নি, তাঁর বিশ্বাস ছিল যে জগদীশ চন্দ্র একসময় ঠিক বিশ্ব বিজ্ঞানের আঙিনায় দেশের হৃত সম্মান পুনরুদ্ধার করবেন। বিবেকানন্দ এবং নিবেদিতা উভয়েই 1899 সালে প্যারিসে জগদীশ চন্দ্রের সাথে মিলিত হন। বোস দম্পতি 1900 সালে উইম্বলডনে

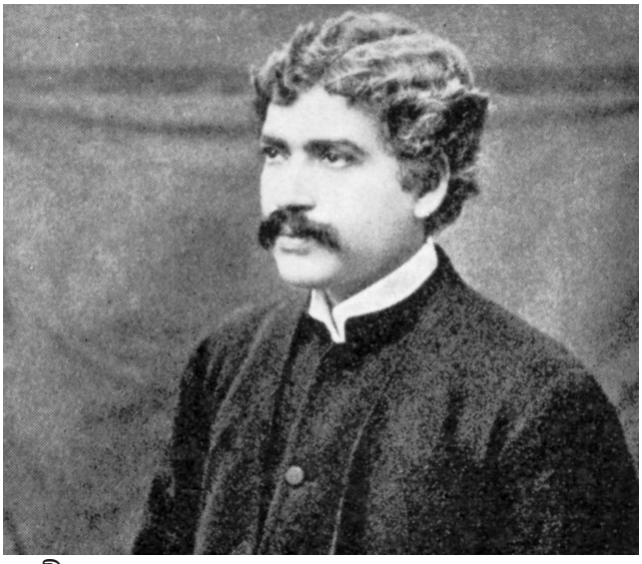

জগদীশ চন্দ্র বসু

নিবেদিতার আঁকা বোস ইনস্টিটিউটের প্রতীকচিহ্ন এবং 1911 সালে জোসেফিন ম্যাকলডকে লেখা জগদীশ চন্দ্রের চিঠির অংশ।

নিবেদিতার বাড়িতে যান। গুরুতর অসুস্থ জগদীশচন্দ্র সেখানে প্রায় এক মাস কাটিয়ে সুস্থ হয়ে দেশে ফেরেন।

নিবেদিতা জগদীশ চন্দ্রের কাজের মধ্যে বেদান্তের ধারণা খুঁজে পেয়েছিলেন—'সমস্ত অস্তিত্বের একত্ব'। পাশ্চাত্যের একাডেমিক জার্নালে জগদীশ চন্দ্রের গবেষণা প্রকাশের সময় তিনি যে বৈষম্যের শিকার হয়েছিলেন তা তাঁর মনে হতাশার উদ্রেক করে। সেটা উপলব্ধি করে নিবেদিতা তাঁকে বইয়ের মাধ্যমে তাঁর কাজকে সরাসরি বিশ্বের কাছে পৌঁছে দিতে উৎসাহিত করেন। তাঁর প্রাণশক্তি এবং বিশ্বাসকে পুনরুদ্ধার করে, নিবেদিতা সক্রিয়ভাবে তাঁকে চারটি বই লিখতে সাহায্য করেছিলেন—Living and Non-Living, Plant Response, Comparative Electro-Physiology ও Irritability of Plants। নিবেদিতা নিজে হাতে এই বইগুলি সম্পাদনা করেন—এই বইগুলির লিখনশৈলী স্পষ্টতই নিবেদিতার সাক্ষ বহন করে, যদিও এই উদ্যোগের জন্য তিনি কখনো কোনও কৃতিত্ব দাবি করেন নি। তিনি রয়্যাল সোসাইটির *ফিলোসফিক্যাল ট্রানজ্যাকশন* জার্নালে প্রকাশিত জগদীশ চন্দ্রের বহু গবেষণাপত্রও সম্পাদনা ও সংশোধন করেন। তিনি জগদীশ চন্দ্রের অসাধারণ প্রতিভা, দৃঢ়তা এবং কৃতিত্বের প্রতি

বোস ইনস্টিটিউট

বোস ইনস্টিটিউটে ভাস্কর বিনায়ক পান্ডুরং কর্মকার নির্মিত জপমালা এবং প্রদীপ হাতে একজন মহিলার বাস-রিলিফ

বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য সংবাদপত্র এবং জার্নালে নিয়মিত তাঁর সম্পর্কে লিখতেন।

নিবেদিতার স্বপ্ন ছিল যে ভারতে নিজস্ব উচ্চমানের গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠুক। অনুপ্রাণিত জগদীশ চন্দ্র সেরকম গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে উদ্যোগী হন। নিবেদিতা তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এই কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহে সচেষ্ট ছিলেন। 1917 সালে, নিবেদিতার মৃত্যুর ছয় বছর পরে, বোস ইনস্টিটিউট-এর উদ্বোধনের সময় জগদীশ চন্দ্র বলেছিলেন, "In all my struggling efforts, I have not been altogether solitary. While the world doubted, there have been a few, now in the city of silence, who never wavered in their trust." তাঁর একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, "ভগিনী নিবেদিতা ভারতের সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রগতির পুনরুজ্জীবনের ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন এবং আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের ভূমিকার প্রতি তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যা আমাকে গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করেছিল।" নিবেদিতার ছোট বোন মিসেস উইলসনকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি বলেছিলেন, "তার শরীর বলে কিছু ছিল না, সবটাই ছিল মন।"

বোস ইনস্টিটিউটে নন্দলাল বোসের আঁকা নিবেদিতার বিখ্যাত চিত্রকর্মের আদলে মহারাষ্ট্রীয় ভাস্কর বিনায়ক পান্ডুরং কর্মকার নির্মিত জপমালা এবং প্রদীপ হাতে একজন মহিলার বাস-রিলিফ রয়েছে যা এই প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার জন্য নিবেদিতার অবদানকে স্মরণ করায়। নিবেদিতার চিতাভস্মও সেখানে রক্ষিত। নিবেদিতা 1906 সালের প্রথম দিকে যে সম্ভাব্য জাতীয় প্রতীক এবং পতাকার নকশা তৈরী এবং প্রস্তাব করেছিলেন, সেই বজ্রই এই প্রতিষ্ঠানের প্রতীক। আজকের দিনে তথ্যের সবথেকে বড়ো এবং সহজলভ্য ভান্ডার যে উইকিপিডিয়া, দুর্ভাগ্যবশত সেখানেও জগদীশ চন্দ্রের ওপর লেখা নিবন্ধে ভগিনী নিবেদিতার কোনো উল্লেখ নেই। ●

লেখক ***ডঃ নকুল পারাশর*** *শান্তি ফাউন্ডেশনের মূল কর্মাধক্ষ্য।*
ইমেল: nakul.parashar@gmail.com

মাংসাশী ছত্রাক

অসিত বরণ দে

ছত্রাক বললেই আমাদের চোখে ভেসে ওঠে বর্ষাকালে মাঠে-ঘাটে গজিয়ে ওঠা ছাতার মত দেখতে একটা চেহারা যাকে বলে মাশরুম, ব্যাঙের ছাতাও বলে। কিন্তু ছত্রাক মানেই তো আর শুধু মাশরুম বা ব্যাঙের ছাতা নয়। ছত্রাক আছে হরেক রকমের। এদের অনেকে আনুবীক্ষণিক এবং আমিষভোজী বা মাংসাশী।

এই রকমই একটি ছত্রাক পাওয়া গেছে অ্যাম্বারের মধ্যে আবদ্ধ অবস্থায়। অ্যাম্বার হল পাইনগাছের রজনের জীবাশ্ম। কাজেই এ হল এক জীবাশ্মের ভিতরে আর এক জীবাশ্ম। এই অ্যাম্বারটি ফ্রান্সের প্যারিসে অবস্থিত National Museum of Natural History-তে সংরক্ষিত আছে। এই অ্যাম্বারের মধ্যে আবদ্ধ অবস্থায় পাওয়া গেছে ডাইনোসোরাসের যুগের মাংসাশী একটি জীবাশ্মীভূত ছত্রাক। এই জীবাশ্মীভূত ছত্রাকটিই এপর্যন্ত আবিষ্কৃত সমস্ত মাংসাশী ছত্রাকগুলির মধ্যে প্রাচীনতম বলে একদল জার্মান বিজ্ঞানী দাবী করেছেন। এটি পাওয়া গেছে ফ্রান্স থেকে। দেখা গেছে এর ফাঁদের মধ্যে বন্দী হয়ে রয়েছে একটি Nematode বা কৃমি। ঠিক কখন থেকে যে ছত্রাক ফাঁদ তৈরি করেছিল তা জানা যায়নি, তবে মেসোজয়িক মহাযুগের ক্রিটেসিয়াস যুগের প্রথমের দিকে অর্থাৎ প্রায় 14 কোটি 50 লক্ষ বছর আগে ছত্রাকের ফাঁদের উদ্ভব হয়েছিল বলে এই দলটি *Science* নামের বিখ্যাত পত্রিকাটিতে 2007 সালে মত প্রকাশ করেছেন। বিজ্ঞানীদের এই দলটির নেতৃত্বে ছিলেন Dr. Alexander Schmidt, যিনি ছিলেন বার্লিনের Museum of Natural History-র বিজ্ঞানী।

মাছের কটন উল ডিসিস

শিকারী ফাঁদ পেতে রাখে শিকার ধরার জন্য। মৃত্তিকাবাসী বেশ কিছু শিকারী ছত্রাকের সরু সরু সুতোর মত শরীরটিতে অনেক ফাঁদ তৈরি হয় আর সেই ফাঁদগুলো এখানে-ওখানে এরা ছড়িয়ে রাখে। মাটিতে বসবাসকারী Nematode বা কৃমি চলাফেরা করতে করতে কখনো কখনো এসে পড়ে ছত্রাকের পেতে রাখা এই ফাঁদের মধ্যে। আর ফাঁদ স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে ফাঁদের কোষগুলো ফুলে ওঠে। ফলে ফাঁদের ফাঁকটা ছোট হয়ে যায় আর কৃমি বেচারা আটকে পড়ে এই ফাঁদে। তখন রেহাই পাওয়ার জন্য সে আপ্রাণ চেষ্টা করে, কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে না। হতভাগ্য কৃমিটির শেষ পরিণতি তখন মৃত্যু। ছত্রাকের সুতোর মত শরীরটা থেকে তখন ক্রমাগত শাখাপ্রশাখা উৎপন্ন হয়ে তা মৃত কৃমিটার শরীরে ঢুকে পড়ে আর কৃমির শরীরটাকে ধীরে ধীরে খেয়ে নিঃশেষ করে।

মাংসাশী ছত্রাকগুলোর অনেকের বাস জলে। তারা অনেকে মাছের শরীরে ঢুকে পড়ে এবং মাছের শরীর খেয়ে বেঁচে থাকে। মাছটা তখন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে, ক্রমে তার মৃত্যু হয়। দেখা গেছে তেচোখা নামের মাছটির শরীরে ঢুকে পড়ে অ্যাফানোমাইসিস নামের এক ছত্রাক। ছত্রাকটিকে তখন তেচোখা মাছের শরীরে পেঁজা তুলোর মত দেখতে লাগে। সেই কারণে এই রোগের নাম Cotton wool disease। মাছের শরীরের ভিতরে এই ছত্রাকের সুতোর মত দেহটা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে আর তখন এই মাছের ত্বকের নীচের রক্তনালীগুলো ফেটে গিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে এবং ত্বকের নীচে এই রক্ত জমাট বেঁধে যায়।

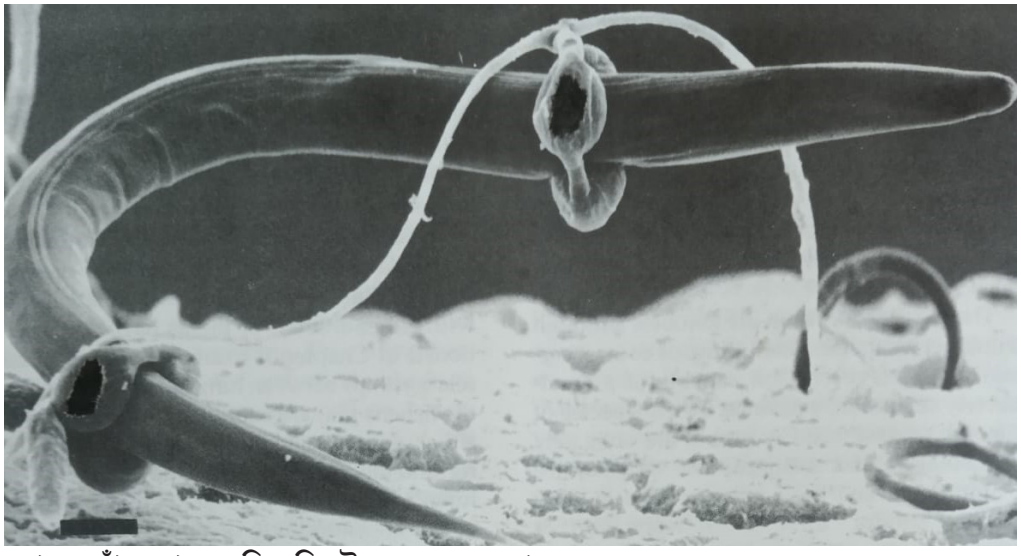

ছত্রাকের ফাঁদে আবদ্ধ কৃমি, ছবি সৌজন্য: জে এল ব্যারন।

কিছু ছত্রাক আবার

মাছের ডিম খেতে ভালোবাসে। এই ছত্রাকের নাম স্যাপ্রোলেগনিয়া। এই ছত্রাক মাছের ডিমের মধ্যে ঢুকে পড়ে ডিমের কুসুমটি খেয়ে নেয়। ফলে এই সমস্ত ডিম ফুটে তখন আর পোনার জন্ম হয় না।

অনেক ছত্রাক আবার পোকামাকড়ের মাংস খেতে পছন্দ করে। *Cordyceps* নামের ছত্রাকটি কিছু পতঙ্গের লার্ভা বা শুয়োপোকার শরীরে সংক্রমণ ঘটায়। এদের শরীরের ভেতর দিয়ে ছত্রাকের সুতোর মত দেহটা বেড়ে চলে আর ধীরে ধীরে শুয়োপোকার শরীরের ভেতরটা খেয়ে ফেলে। ফলস্বরূপ, পড়ে থাকে শুধু শুয়োপোকার বাইরের খোলসটা। ক্রমে এটা পরিণত হয় শুয়োপোকার একটা মমিতে। যখন ছত্রাকটা শুয়োপোকার শরীরের মধ্যে যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় তখন শুয়োপোকার মাথার দিকে ছত্রাকের শরীর দিয়ে তৈরি হয় কালো রঙের সরু কাঠির মত শক্ত একটা গঠন। *Cordyceps*-এর এই কাঠির মত অংশগুলো অত্যন্ত দামী। এগুলোর কেজি প্রতি দাম 1 লক্ষ টাকা। এগুলো থেকে স্টেরয়েড পাওয়া যায় যা বিভিন্ন ওষুধ তৈরীর কাজে লাগে।

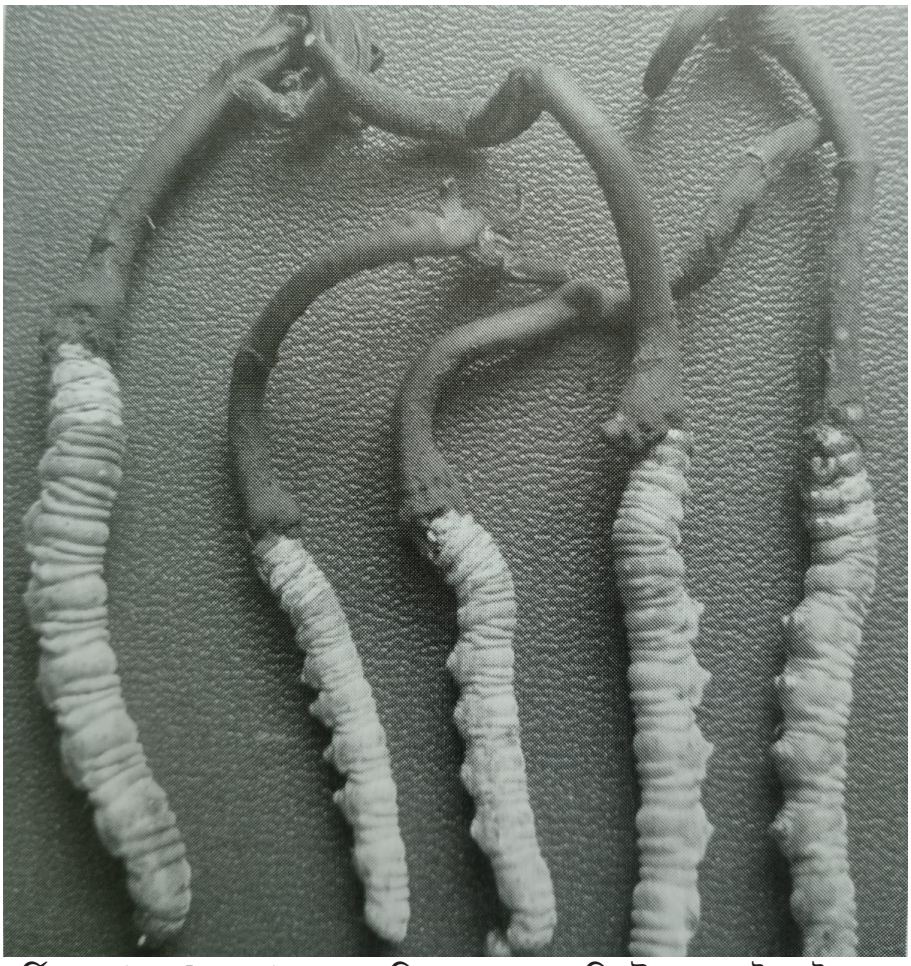

কর্ডিসেপস (Cordyceps) দ্বারা সংক্রমিত শুয়োপোকা, ছবি সৌজন্য: ওয়াই জে ইয়ো।

এছাড়া সিলোমাইসিস নামের একটি ছত্রাকের বিভিন্ন প্রজাতি মশার লার্ভা বা শূককীটের খাদ্যনালির মধ্যে প্রবেশ করে এবং তাদের মাংস খেয়ে বেঁচে থাকে। *সিলোমাইসিস ইন্ডিয়ানা* অ্যানোফিলিস মশার আর *সিলোমাইসিস পেন্টাঙ্গুলেটাস* কিউলেক্স মশার শূককীটের মাংস খায়। এর ফলে এইসব মশার শূককীটগুলোর মৃত্যু হয়।

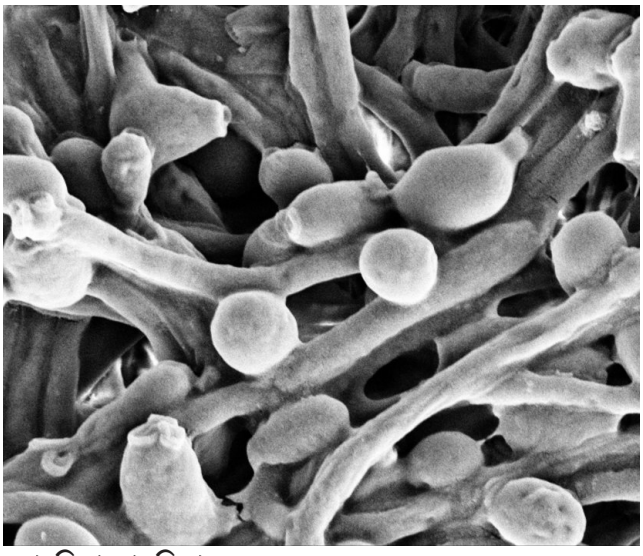

ক্যানডিডা আলবিকান্স

মানুষের মাংস খেতে ভালবাসে এমন ছত্রাকের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। *Candida albicans* নামের ছত্রাকটি মানবশারীরের ত্বকে ক্যান্ডিডোসিস নামের রোগ সৃষ্টি করে, আর *Trichophyton* নামের ছত্রাকটির বিভিন্ন প্রজাতি মানবশরীরে দাদ নামের রোগ সৃষ্টি করে। আমাদের অতি পরিচিত ছুলি নামের ত্বকের রোগটিও ঘটে ছত্রাকের জন্য। এই ছত্রাকগুলোকে বলে ডার্মাটোফাইট আর এরা যে রোগ সৃষ্টি করে তাদের বলে ডার্মাটোমাইকোসিস। এই ছত্রাকগুলো মানব ত্বকের মাংস খেয়ে বঁচে থাকে—বেড়ে ওঠে।

মাংসাশী ছত্রাক প্রকৃতির এক বিচিত্র সৃষ্টি। বিবর্তনের কোন পথ ধরে কিভাবে এদের খাদ্যাভ্যাস মাংসাশী প্রাণীদের মত হয়ে উঠল তা বড়ই আশ্চর্যজনক। হয়তো একদিন এই রহস্য উন্মোচিত হবে। আমরা বসে রইলাম সেই অনাগত ভবিষ্যতের পথ চেয়ে।

লেখক ***ডঃ অসিত বরণ দে*** *বর্ধমান রাজ কলেজের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক এবং লোকবিজ্ঞান প্রবন্ধ লেখক।*
ইমেল: abde.brc@gmail.com

আন্তর্জাতিক বন্যপ্রাণী দিবস

সুরক্ষিত থাকুক প্রতিটি প্রাণ

অমর কুমার নায়ক

চারদিকে এখন হাহাকার শোনা যায়, পরিবেশ নাকি বিপন্ন। সঙ্কটে বন্যপ্রাণীরা, সেই সঙ্গে আমরাও। তাই একদল মানুষ অন্য যে দল এখনও ঘুমিয়ে তাদের জাগাতে উঠে পড়ে লেগেছে। আসলে এই জেগে ওঠা বেশী পুরানো দিনের নয়। কিছুকাল আগেও মানুষ ভাবত সবকিছুই হয়ত ঠিকই আছে। তাই ছিলও, প্রাচীন ভারতের বন্যপ্রাণীদের ইতিহাস জানার সবথেকে আদর্শ উৎস শিকারের গল্প আর ব্রিটিশ ভারতের গবেষণা প্রবন্ধ। শিকারের গল্প পড়ার মধ্যে দিয়ে জেনে নেওয়া যায় কেমন ছিল সেকালের বন্যপ্রাণ সমৃদ্ধ ভারতবর্ষ। শিকারের রীতি আজকের নয় বহুকালের। সেকালের রাজা, মহারাজা, বড় জমিদার বা সাহেব সুবোদের বিনোদনের উপায় ছিল শিকার খেলা। শুধু পুরুষেরা নয় অনেক স্ত্রীলোক এই খেলায় সমান পারদর্শী ছিলেন। ঋজুদার গল্পগুলো পড়তে পড়তে হটাৎ আমার ধুলো জমা স্মৃতির পাতা থেকে আমার দেখা বন্যপ্রাণ শিকারের ছবি ভেসে উঠল। আমার গ্রামে থাকা আদিবাসী পাড়ার মানুষদের খটাস, গোসাপ, বুনো খরগোস বা ভাম প্রভৃতি শিকারের ছবি। এখন সেসব আর দেখা যায়না। আসলে শিকারের জন্য সেসময় যে পর্যাপ্ত বন্যপ্রাণী ছিল তার অবশিষ্ট যা আছে তাও গননার আওতায় আসেনা। শিকার ভারত ভূখণ্ডের প্রাচীন রীতি। সংস্কৃতি বলতেও দ্বিধা নেই। তবে বন্যপ্রাণ শিকারের সব দোষ আদিবাসীদের নয়। প্রয়োজনে সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি পালনে ওরা শিকার উৎসবে মাতে কিন্তু যারা 'ভুবন সোমের' মতো শিকার খেলতে নিছক বিনোদনের জন্য হাজারো বাঘ অথবা পাখির নিধনে মেতে ওঠে তাদের ক্ষমা নেই।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠা জাতীয় উদ্যানগুলি আসলে ছিল তৎকালীন রাজা মহারাজা এবং ব্রিটিশ শাসকদের মৃগয়া ক্ষেত্র। যতেচ্ছ হারে শিকার করতে করতে আজ বন্যপ্রাণ বিপন্ন। শিকার করার গল্পের কথা এলে জিম করবেটের নাম আসবেই। এই মানুষটিও বদলে যান, শিকারি থেকে হয়ে ওঠেন পরিবেশ রক্ষক। মানুষটি উপলব্ধি করেছিলেন শিকার করে নয় বন্যপ্রাণীদের ডকুমেন্টেশন করে তাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। তেমনি আমাদের কাছের মানুষ বুদ্ধদেব গুহ 'ঋজুদা' বন্দুক ছেড়ে তুলে নেন কলম। তার শিকার স্মৃতিতেও ধরা পড়ে অরণ্য ও আরণ্যকদের প্রতি তার অফুরান ভালোবাসা। বিশ্বব্যাপী যখন জীববিজ্ঞানী ও পরিবেশবিদরা বুঝতে পারলেন আমাদের বন্যপ্রাণ সুরক্ষিত নয় তখন শুরু হল যা কিছু আছে তাকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা। সেই চেষ্টার সুফলও মিলেছে। তবে এখনও মানুষকে সচেতন করতে এবং সংরক্ষণ চালিয়ে যেতে ডাস্টবিনে লেখা 'ইউস মি'-র মত বছরের পর বছর পালন করতে হবে আন্তর্জাতিক বন্যপ্রাণী দিবস। বিশেষ অনুষ্ঠান ও উদযাপনের মধ্যে দিয়ে বছরভর বন্যপ্রাণীদের আগলে রাখার কর্মকাণ্ডকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। যারা বনে থেকে প্রকৃত বন রক্ষকের কাজ করেন তাদের সহযোগিতায় আজ আবার অরণ্যে আরন্যকের সমারোহ বেড়েছে।

প্রকৃতি সুস্থ ও সুন্দর তখন থাকবে যখন সমস্ত প্রাকৃতিক সদস্যদের সংখ্যা সঠিক অনুপাতে বিন্যস্ত থাকবে। পরিবেশের মৌলিক উপাদানগুলির যেমন প্রয়োজন আমাদের জীবন ধারণে, তেমনি আমাদের বাস্তুতন্ত্রের প্রতিটি উদ্ভিদ ও প্রাণীর নির্দিষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ সহাবস্থানেরও প্রয়োজন। তাই সবদিক ঠিকঠাক রাখার দায়ও আমাদের। বিশেষত যখন আমরাই অনিষ্ট করছি আমাদের পরিবেশের। উদ্ভিদভোজীদের স্বার্থে যেমন থাকতে হবে উদ্ভিদকে তেমনি মাংসাশীদের স্বার্থে উদ্ভিদভোজীদের। কিন্তু বর্তমানে আমাদের বেহিসাবি লোভের বলি হয়ে বন্যপ্রাণীরা আজ বিপন্ন। আর তাই এই কথা মাথায় রেখে শুরু হয় বিশেষভাবে আন্তর্জাতিক বন্যপ্রাণী দিবস পালন। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ 20'শে ডিসেম্বর 2013 প্রস্তাবনা পেশ করে 3'রা মার্চ দিনটিকে বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস হিসাবে পালন করার। যার উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষের কাছে বিশ্বের বন্যপ্রাণী এবং উদ্ভিদকুলের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি করা। এরপর 2013 সালের 3'রা থেকে 14'ই মার্চ

থাইল্যান্ডের ব্যাংককে আয়োজিত আন্তর্জাতিক বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণী এবং উদ্ভিদের বাণিজ্য সম্মেলনে (সিআইটিইএস) নিশ্চিত করা হয় যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রভাবে যাতে বন্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর টিকে থাকতে আশঙ্কার সৃষ্টি না হয়। পরে জাতিসংঘের সাধারণ সভায় 3'রা মার্চ দিনটিকে 'বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। জাতিসংঘের রেজুলেশনে এই বিবৃতি দেওয়া হয় যে মানব কল্যাণে বন্য উদ্ভিদ ও প্রাণীদের অপরিহার্য মূল্যের কথা মাথায় রেখে উভয়ের যুগ্ম উন্নোয়নের দিকগুলি উন্মোচিত করাই লক্ষ্য হবে এই বিশেষ দিবস পালনের। 2015 সাল থেকে প্রতি বছর একটি সুনির্দিষ্ট প্রসঙ্গ বিষয় নির্ধারণ করে পালন করা হচ্ছে জাতিসংঘের প্রায় সবকটি সদস্য দেশে। এই বছরের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ দিবসের মূল ভাবনা হল 'মানুষ ও পৃথিবীর সংযোগ স্থাপনঃ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে তথ্যপ্রযুক্তি উদ্ভাবন অন্বেষণ'। এই থিমের মূল বিষয় হল ক্রমবর্ধমান সংযুক্ত বিশ্বে, বাস্তুতন্ত্র ও কমিউনিটির উপর তথ্য প্রযুক্তির যথোপযুক্ত হস্তক্ষেপ গ্রহণ। এই বছরের বিষয় ভাবনার লক্ষ্য হল তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ; বন্যপ্রাণ ব্যবসা, চোরাচালান দমন ও মানুষ এবং বন্যপ্রাণীদের সহাবস্থানের উপযুক্ত পন্থা গ্রহণ।

পৃথিবীর বৈচিত্রময় এই জীবসম্ভারকে টিকিয়ে রাখতে হলে শুধু বিশেষ দিন পালনে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক মাত্রায় ব্যবহার এবং মৌলিক উপাদানগুলিকে প্রকৃতিতে ফিরিয়ে দিতে হবে। সমগ্র জীবকুলকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করে বিপদগ্রস্থ তালিকার প্রাণীদের বিশেষ সংরক্ষণ দিতে হবে। বিশ্বব্যাপী বন্যপ্রাণীদের উপর চলা বিভিন্ন অপরাধ রোধ করতে কড়া আইন প্রণয়ন করে তার বাস্তবায়ন করতে হবে। জনসাধারণের মধ্যে সংরক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরা প্রয়োজন। পুকুরের মাছ মাছরাঙা বা বকের থেকে বাঁচাতে পুকুরের মাঝামাঝি নাইলনের ফাঁসি জাল ঝোলানো থাকে। শীতের সময় পরিযায়ী হাঁসদের শিকার করা হচ্ছে মাংসের লোভে। কোথাও ব্যবহার হচ্ছে বন্দুক তো কোথাও বিষ ইঞ্জেকশন। একদল মানুষ এখনও মাঠে ঘাটে মরণফাঁদ আড়িজাল পেতে রাখে বনমোরগ, তিতির বা বন খরগোসের শিকার করতে। এইসব অন্যায় বন্ধ করতে মুষ্ঠিমেয় অরণ্যপ্রেমী সংগঠন নয়, সমাজের সর্ব স্তরে পালন করতে হবে এই বিশেষ দিনগুলি। বিদ্যালয়েও পালন করা প্রয়োজন এই দিনগুলি, তবেই শিশুমনে গড়ে উঠবে বন্যপ্রাণ প্রীতি। সংরক্ষণের রিলে রেসের 'ব্যাটন' হাত বদল হবে এভাবেই। ●

লেখক ***শ্রী অমর কুমার নায়ক*** *একজন শিক্ষক এবং বিজ্ঞানলেখক।*
ইমেল: amarnayak.stat@gmail.com

ক্ষতিগ্রস্ত জিনের মেরামতি

সিদ্ধার্থ রায়

পরিব্যক্তি (mutation) কথাটির অর্থ জীবের জিনোম অনুক্রমের মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন। বিভিন্ন কারণে যে কোন জীবের কোষের মধ্যে থাকা জিনোমে বিভিন্ন ধরনের পরিব্যক্তি ঘটতে পারে। পরিব্যক্তি জিনোমের যে কোনো স্থানেই ঘটতে পারে। যেহেতু মানুষের জিনোমের কমবেশি 98 শতাংশ প্রোটিন তৈরীর সংকেত বহন করে না, যাকে সাধারণ ভাষায় "জাঙ্ক (junc)" ডিএনএ বলা হয়, সেইহেতু বেশিরভাগ পরিব্যক্তিই ব্যক্তির উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে না এবং ফলতঃ সেগুলি অজানাই থেকে যায়। যদি জিনের অনুক্রমে কোন পরিব্যক্তি ঘটে তবে সেটি জীবের ভৌতিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। মানুষের হিমোগ্লোবিন প্রোটিন শৃঙ্খলে কেবল একটি অ্যামিনো এসিড পরিবর্তিত হলে "সিকেল সেল" নামক জিন সংক্রান্ত রোগ অথবা প্রাণঘাতী Hbc নামক জিনগত রোগ দেখা দেয়। জীবের ডিএনএ অনুর মধ্যে স্বাভাবিক কারণেই পরিব্যক্তি ঘটতে থাকে। এগুলি ঘটে কোনো সময়ে কোষ মধ্যস্থ বিভিন্ন কর্মকান্ডের মধ্যে কোনো ভুলচুকের জন্য অথবা পরিবেশের প্রভাবে। এই ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত পরিব্যক্তির হার বিভিন্ন জীবের ক্ষেত্রে বিভিন্ন এবং সেই হারকে পরিব্যক্তির স্বাভাবিক হার হিসাবে গণ্য করা হয়। সাধারণত যে সব ধরনের পরিব্যক্তি ঘটে সেগুলি হল-

জিনের মধ্যে একটি স্থানের বেসের পরিবর্তন যাকে "পয়েন্ট পরিব্যক্তি" বলা হয়। এক্ষেত্রে কোন একটি বেসের স্থান অন্য একটি বেস দখল করে। এই ঘটনাটি কোন রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে ঘটতে পারে অথবা ডিএনএ অনুর এপ্লিকেশনের সময় ত্রুটির কারণেও ঘটতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, GC বেস যুগলের স্থানে AT যুগলটির স্থান গ্রহণ অথবা ঠিক তার উল্টোটি। আরেক রকম পয়েন্ট পরিব্যক্তি ঘটে, যদিও অনেক কম মাত্রায়, যেখানে AT যুগলের স্থানে বসে TA অথবা GC-র স্থানে CG বেস যুগল।

অপর এক ধরনের পয়েন্ট পরিব্যক্তির ফলে বেস যুগলের স্বাভাবিক সমবায়টি বদলে যায়, যেমন A -র সঙ্গে C বেস যুক্ত হয়ে সৃষ্টি করে অস্বাভাবিক AC যুগল অথবা একইভাবে GT যুগল। এই ধরনের পরিব্যক্তিকে বলে "বেস যুগলের ত্রুটি" বা "base mispairing"।

উপরোক্ত দুই ধরনের পয়েন্ট পরিব্যক্তি যেহেতু জিনের একটি কোডনকে পরিবর্তন করে অর্থাৎ এই জিন থেকে তৈরি হওয়া প্রোটিনের মধ্যে একটি স্থানে একটিমাত্র অ্যামিনো অ্যাসিডের পরিবর্তন ঘটে, সাধারণত এই পরিবর্তনের ফলে প্রোটিনটি একদম ত্রুটিমুক্ত না হলেও তার উদ্দিষ্ট কাজ চালিয়ে নিতে পারে।

পয়েন্ট পরিব্যক্তির তুলনায় অনেক ক্ষতিকর হলো "ফ্রেমশিফ্ট পরিব্যক্তি (frameshift mutation)"। প্রোটিন তৈরি করার সময় পর পর তিনটি বেস নিয়ে গঠিত এক একটি কোডনে সংকেত অনুসারে অ্যামিনো এসিড যুক্ত করা হয়। পরিব্যক্তির ফলে যদি জিন অনুক্রমের মধ্যে একটি অতিরিক্ত বেস ঢুকে পড়ে অথবা বর্জিত হয়, তবে সংকেত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ফ্রেমশিফ্ট ঘটে। ফলে তারপর থেকে জিনের সংকেতগুলি পরিবর্তিত হয়ে যায়। এর অর্থ হল, তারপর থেকে অ্যামিনো এসিডের অনুক্রমগুলি বদলে যাওয়া। ফলতঃ যে প্রোটিনটি তৈরি হবে সেটি খুব সম্ভব তার অভীষ্ট কাজ করতে অসমর্থ্য হবে। ডিএনএ রেপ্লিকেশনের সময় বিশেষ রাসায়নিকের প্রভাবে এরূপ পরিব্যক্তি ঘটতে পারে।

যেসব কারণে ডিএনএ অণুর পরিব্যক্তি ঘটতে পারে তার মধ্যে মুখ্য কারণগুলি হ'ল-

(ক) আলফা, বিটা, গামা, অথবা এক্স-রশ্মির প্রভাবের ডিএনএ অণুর অনুক্রমে বিচ্যুতি ঘটতে পারে, বিশেষ করে ডিএনএ শৃংখল থেকে বেস যুগলের স্থানচ্যুত হওয়ার মাধ্যমে।

(খ) অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে অনেক সময় ডিএনএ অনুর মধ্যে পরপর অবস্থিত দুটি থাইমিন (T) অথবা দুটি সাইটোসিন (C) বেস যুক্ত হয়ে যায়। এর ফলে ডিএনএ অণুর রেপ্লিকেশন বন্ধ হয়ে যায় এবং এই ত্রুটির মেরামতির প্রয়োজন হয়। মেরামতি সঠিকভাবে না ঘটলে অন্য ধরনের কোন পরিব্যক্তি ঘটতে পারে।

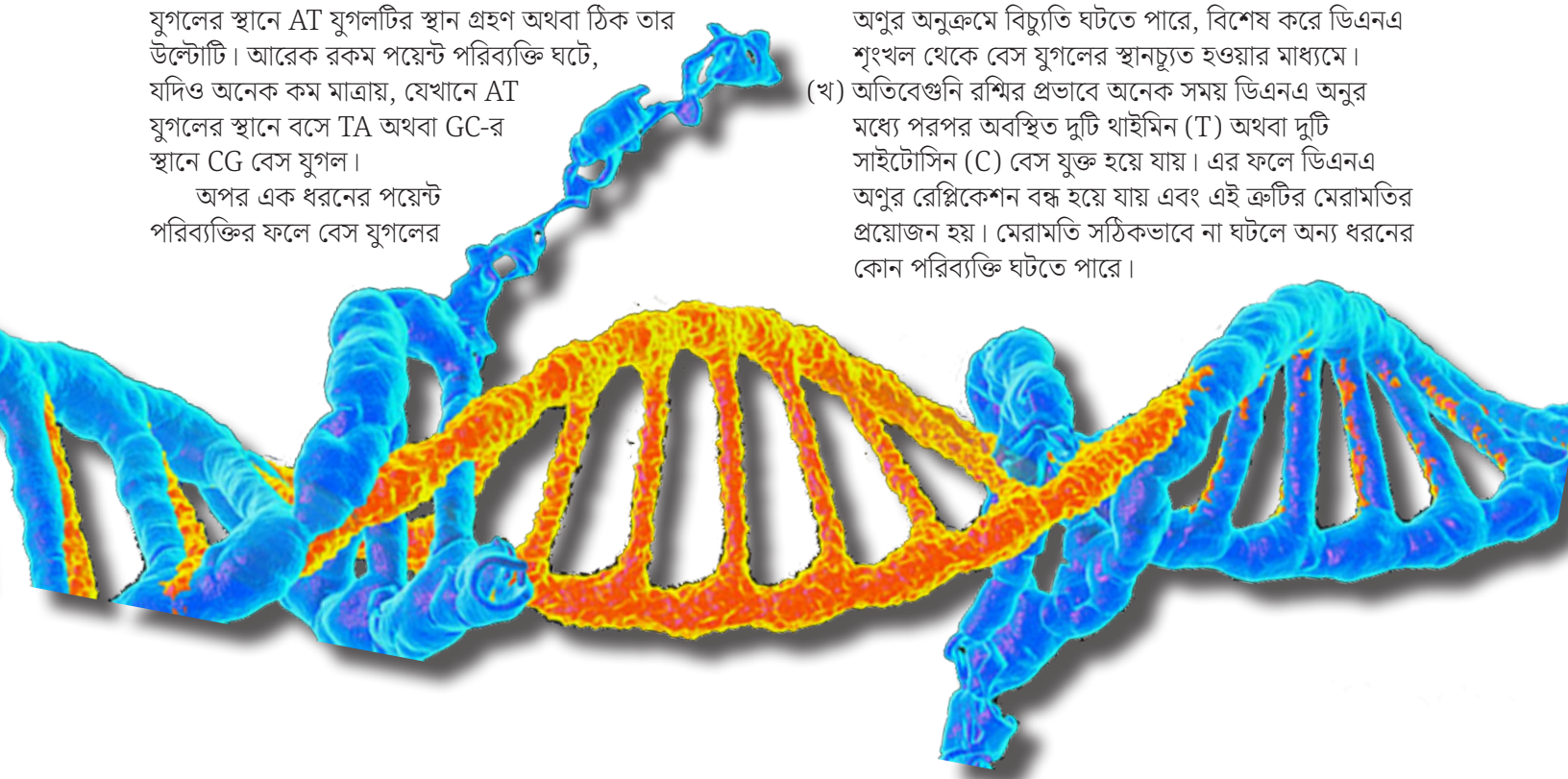

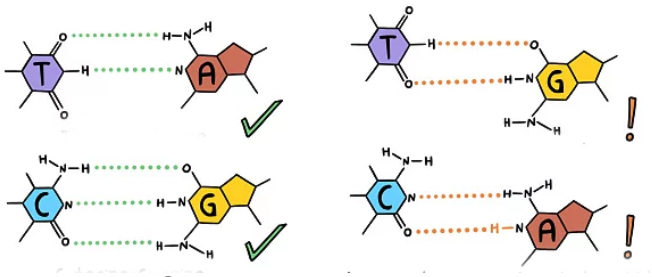

বেস যুগলের ত্রুটি

ফ্রেমশিফ্ট পরিব্যক্তি

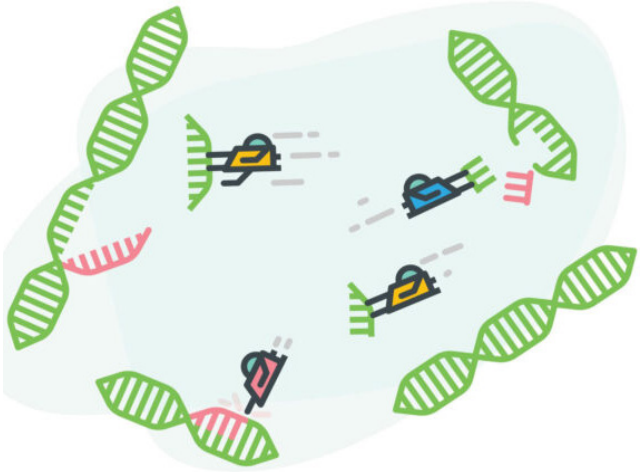

জিন মেরামতি

(গ) বিশেষ ধরনের কিছু জৈবরসায়নিক পদার্থ ডিএনএ-এর অনুক্রমে পরিবর্তন ঘটাতে পারে। এক ধরনের জৈব পদার্থ আছে যাদের অনুর সংযুক্তি কোন একটি বেসের অনুরূপ। ডিএনএ অনুর যখন রেপ্লিকেশন চলে, তখন এই পদার্থটি নির্মীয়মান ডিএনএ শৃঙ্খলের সঙ্গে জুড়ে ডিএনএ অণুর অনুক্রম বদলে দিতে পারে। কিছু রাসায়নিক পদার্থ আছে যা বেসগুলিকে এমনভাবে পরিবর্তিত করতে পারে যাতে তারা যাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বেস যুগল তৈরি করার কথা তা না করে অনভিপ্রেত বেস যুগল সৃষ্টি করতে পারে। আরেক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ আছে যারা সরাসরি ডিএনএ অণুর শৃঙ্খলের মধ্যে ঢুকে ডিএনএ অনুর রেপ্লিকেশন এবং ট্রান্সক্রিপশনে বাধা সৃষ্টি করে।

(ঘ) পরিবেশগত কারণে অথবা কোষ বিভাজনের সময় ঘটা রেপ্লিকেশনের সময় পদ্ধতিগত কারণেও পরিব্যক্তি ঘটে।

উপরোক্ত কারণগুলির জন্য মানুষের জিনে প্রায়শই পরিব্যক্তি ঘটে। কোন এক ব্যক্তির জিনোমে তার সমগ্র জীবনের গড়ে 64টি পরিব্যাপ্তি ঘটে (সংখ্যাটি জিন বিজ্ঞানীদের অনুমান মাত্র)। এটি শুনে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। মানব জিনোমের যেহেতু 98%-ই জাঙ্ক ডিএনএ, তাই বেশিরভাগ পরিব্যক্তিই ঘটে এই জাঙ্ক ডিএনএ-র মধ্যে, যার কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া নেই বললেই চলে। ডিএনএ অনুর পরিবর্তন সত্ত্বেও যেসব ক্ষেত্রে ব্যক্তির মধ্যে কোনরূপ মন্দ প্রভাব দেখা যায় না সেগুলোকে পরিব্যক্তি হিসেবে ধরাই হয় না। যে পরিব্যক্তিগুলি জিনকে পরিবর্তিত করে, সেগুলিও মূলত ঘটে কোন একটি সোমাটিক কোষে অর্থাৎ জনন কোষগুলি ব্যতীত দেহের বাদবাকি যেকোনো একটি কোষে। কোন একটি সোমাটিক কোষের পরিব্যক্তির ফলে সাধারণত বিপজ্জনক কিছু ঘটে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেই কোষটির বিভাজন ঘটেনা। যদি ঘটেও এবং যদি তার ফলে কোন ব্যক্তির কোন বাহ্যিক রোগ বা অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়, সেটি সেই ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে দেহের একটি সোমাটিক কোষের পরিব্যক্তির ফলে যে বিপজ্জনক একটি ঘটনা ঘটলেও ঘটতে পারে, সেটি হলো সেই কোষটির নিয়ন্ত্রণহীন কোষ বিভাজনের প্রবণতা এবং তার অপত্য কোষগুলিও একইভাবে সমানে বিভাজিত হতে থাকা। চিকিৎসাশাস্ত্রের ভাষায় একেই বলে "ক্যান্সার"।

ডিএনএ অনুর মধ্যে বিভিন্ন কারণে যেমন বিভিন্ন ধরনের ত্রুটি ঘটে, সেই ত্রুটিগুলিকে মেরামত করার জন্য কোষও নানা ধরনের প্রক্রিয়ার সাহায্য নেয়। এইসব প্রক্রিয়াগুলিকে "জিন মেরামতি" বলে।

দুর্ভাগ্যবশত সময় সময় পরিব্যক্তি ঘটতে পারে একটি জনন কোষের জিনেও। এইরূপ জনন কোষীয় পরিব্যক্তির ফলে উদ্ভূত পরিবর্তন ব্যক্তির বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত হতে পারে। যৌন কোষে ত্রুটিপূর্ণ জিন থাকলে সাধারণত সেই কোষ ভ্রূণ সৃষ্টি করতে অক্ষম হয় অথবা ভ্রূণকোষটি গর্ভপাতের মাধ্যমে নষ্ট হয়ে যায়। ত্রুটিপূর্ণ জিন নিয়ে যদি শিশু জন্মগ্রহণও করে, তবে সেই শিশুর সাধারণত জিন সংক্রান্ত কোনো রোগে আক্রান্ত হয়। কদাচিৎ যদি সেই জিনের পরিবর্তন অপত্য বংশের জন্য শুভ হয় তবে তা অপত্য বংশের মধ্যে স্থায়ী হয়। জীবজগতে অভিব্যক্তি এই ভাবেই ঘটছে এবং ঘটে চলেছে।

ডিএনএ অনুর মধ্যে বিভিন্ন কারণে যেমন বিভিন্ন ধরনের ত্রুটি ঘটে, সেই ত্রুটিগুলিকে মেরামত করার জন্য কোষও নানা ধরনের প্রক্রিয়ার সাহায্য নেয়। এইসব প্রক্রিয়াগুলিকে "জিন মেরামতি (gene repair)" বলে। এই বিভিন্ন মেরামতি

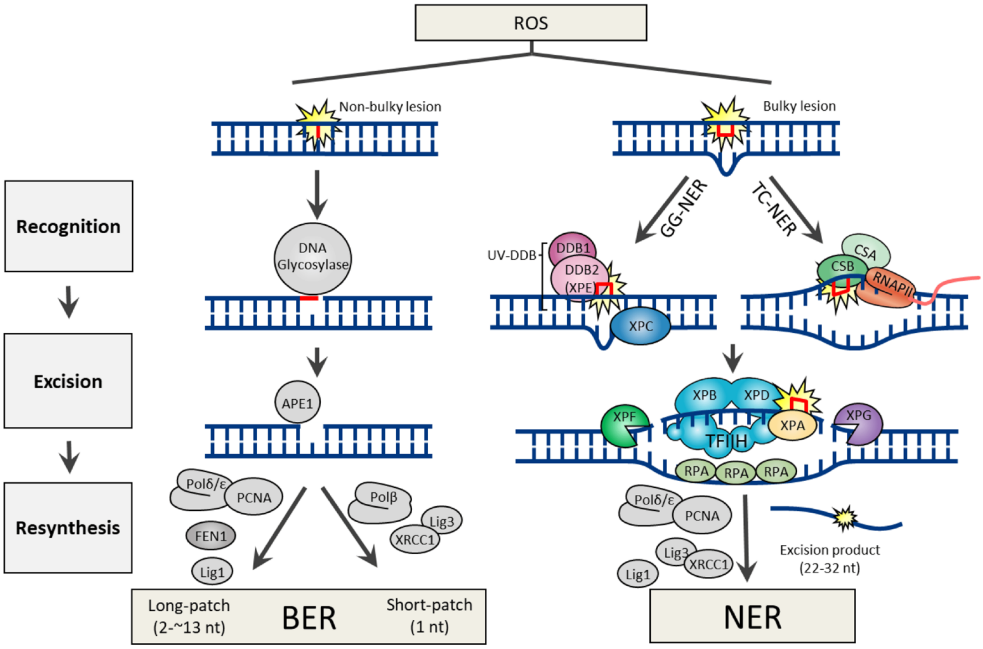

এক্সিসন

প্রক্রিয়াগুলি জিনের ত্রুটি অনুসারে কাজ করে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে ডিএনএ অণুর মধ্যে পরপর অবস্থিত দুটি থাইমিন (T) অথবা দুটি সাইটোসিন (C) বেস অণু যুক্ত হয়ে জিনের ত্রুটি ঘটাতে পারে। এই ধরনের ত্রুটি নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীদের ক্ষেত্রে দূর হয় সূর্যালোকের সাহায্যে। সূর্যালোক গায়ে পড়লে এদের এক ধরনের জিন সক্রিয় হয় এবং "ফোটোলিয়েস" নামক একটি উৎসেচক সৃষ্টি করে যা ওই ত্রুটি সারাতে সক্ষম। উন্নততর, বিশেষ করে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াটি কাজ করে না। অভিব্যক্তির সময় কোন এক পর্যায়ে এই উৎসেচকটি তৈরি করার জিনটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এই পদ্ধতিটিকে "ফোটোরিএক্টিভেশন" বলা হয়।

যদি ডিএনএ অনুর একটি শৃঙ্খলে এক বা একাধিক বেসের মধ্যে ত্রুটি ধরা পড়ে তবে কোষের মধ্যে "এক্সিসন" নামক একটি বিশেষ পদ্ধতি মেরামতির কাজটি করে। অনুক্রমের কোথায় ত্রুটি ঘটেছে সেটি বের করার বন্দোবস্ত করা হয় কোন স্থানে প্রোটিন তৈরি বন্ধ রয়েছে অথবা তৈরি প্রোটিনের কোন স্থানে ত্রুটি আছে সেটি নির্ণয় করে যেখানে ত্রুটিটি অবস্থিত সেটি নির্ণীত হয়। তারপর সেখানে প্রথমে একটি উৎসেচকের সাহায্যে শৃঙ্খলটি কেটে ফেলা হয়। তারপর অপর একটি উৎসেচক প্রয়োগ করে সেই স্থান থেকে যেদিকে ত্রুটি আছে সেদিকের একবার একাধিক নিউক্লিওটাইড কেটে ফেলে সঠিক নিউক্লিওটাইডকে সেখানে বসিয়া শৃঙ্খলটির সঙ্গে দুদিকেই জুড়ে দেওয়া হয়। সঠিক নিউক্লিওটাইডগুলিকে ডিএনএ অণুর দ্বিতীয় শৃঙ্খলটি থেকে রেপ্লিকেশন এর মাধ্যমে তৈরি করা হয়। এক্সিসন (excission) কথাটির বাংলা অর্থ অস্ত্রোপচার। এই পদ্ধতিতে কোষ যেন অস্ত্রোপচার করে জিনের ত্রুটিপূর্ণ অংশকে বাদ দিয়ে সেখানে একটি নির্ভুল অংশকে জুড়ে দিচ্ছে।। বেস যুগলের সমবায়ের সমস্যাও এই অ্যাক্সিসন পদ্ধতিতে ত্রুটিমুক্ত করা হয়।

কোন কারনে যদি একটি ডিএনএ অণুর দুটি শৃঙ্খলের মধ্যে কোন একটি ছিঁড়ে যায় তবে ছিঁড়ে যাওয়া দুটি অংশকে দ্রুত জুড়ে দেওয়া হয় কতগুলি উৎসেচকের সাহায্যে। মানুষসহ মেরুদন্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে এক্সিসন জিন মেরামতি পদ্ধতিই সাধারণত কাজ করে।

যখন ডিএনএ অণুর ত্রুটি খুব জটিল হয় এবং তা মেরামতি করা সম্ভব হয় না তখন কোষটির বিভাজনের মাধ্যমে সেই ত্রুটি যাতে ছড়িয়ে না পড়ে তা রোধ করার জন্য কোষটিকে বিনাশ করে ফেলা হয়। দেহকে সুস্থ রাখার প্রক্রিয়া হিসেবে অতি পুরাতন অথবা বেশি মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত কোষকে নিয়মমাফিক মেরে ফেলার পদ্ধতির পারিভাষিক নাম "অ্যাপোপটোসিস (apoptosis)"। অ্যাপোপটোসিসস কথাটি এসেছে একটি ল্যাটিন শব্দ থেকে যার অর্থ ঝরে পড়া, যেমন গাছেদের পাতা ঝরে পড়ে। অ্যাপোপটোসিস একদিকে যেমন ক্যান্সার জাতীয় রোগকে প্রতিহত করে, তেমনি কোনো কারণে প্রয়োজনাতিরিক্ত কোষ বিনাশের ফলে নানা ধরনের রোগও সৃষ্টি করতে পারে। অ্যাপোপটোসিস পদ্ধতিতে মৃত কোষগুলি ক্ষুদ্রতর অংশে ভেঙে গেলে সেগুলিকে রক্তের মধ্যে বর্তমান অনুজীবনাশক কোষগুলি নিজেদের মধ্যে নিয়ে পরিষ্কার করে ফেলে। এইসব পদ্ধতি পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে প্রাণীদেহ এক নিখুঁতভাবে চলা বিশাল রাসায়নিক কারখানা।

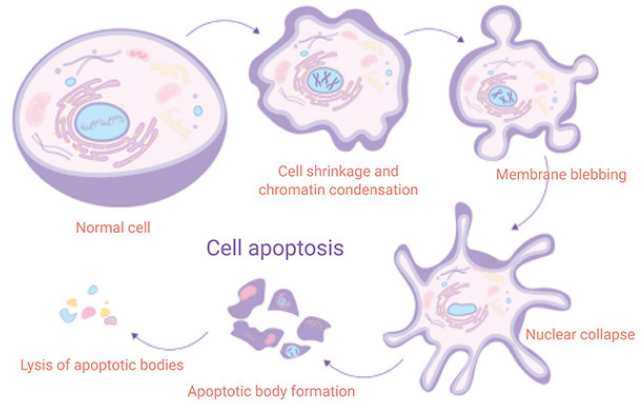

অ্যাপোপটোসিস

লেখক ***ড. সিদ্ধার্থ রায়*** *এন.আই.টি.টি.টি.আর, কোলকাতার প্রাক্তন অধ্যাপক ও নির্দেশক এবং লোকবিজ্ঞান প্রবন্ধ লেখক।*
ইমেল: raysiddhartha@yahoo.com

ভেষজ উদ্ভিদ গবেষণা ও চিকিৎসা জগতে নতুন দিগন্ত—একটি গবেষণাপত্র

রণিতা দত্ত, শিঞ্জিনী মিত্র ও এণা রায় ব্যানার্জী

ঠান্ডা লেগেছে? তুলসী পাতা বেটে মধু দিয়ে খাও। নয়তো পাচন খাও যাতে থাকে তেজপাতা, দারচিনি, লবঙ্গ, গোলমরিচ, আদা আর মিশরি।

বসন্তকাল এসে গেছে, নিমপাতা আনতে হবে, যাতে চিকেন পক্স না হয়।

পা মচকে গেছে? চুন-হলুদ লাগিয়ে নাও এক্ষুনি ঠিক হয়ে যাবে।

এইসব ঠাকুমা-দিদিমাদের টোটকা নিয়েই আমরা বড় হয়েছি। প্রতিটি বাঙালি বাড়িতেই এইসব ঔষধি গাছ-এর ওপর অগাধ বিশ্বাস ছিল, এবং আজও আছে। কিন্তু এই গাছগুলোর লাভজনক প্রভাব আসে কোথা থেকে? এদের মধ্যে থাকে 'ফাইটোকেমিক্যালস' যা হল গঠনগতভাবে বিচিত্র রাসায়নিক যৌগগুলির একটি গোষ্ঠী, যা গাছেরা তৈরি করে নিজেদের জীবাণু থেকে রক্ষা করতে। এই উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত ফাইটোকেমিক্যালস-এর মধ্যে প্রদাহবিরোধী এবং অ্যান্টিঅক্সিডেটিভ সক্রিয়তা রয়েছে বলে জানা গেছে। ফাইটোকেমিক্যালস বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, যেমন ক্যারোটিনয়েডস, পলিফেনল, ফেনলিক অ্যাসিড, লীগন্যান আর ফ্লাভোনয়েড। আমাদের ঐতিহ্যগত জ্ঞানের ভান্ডারে এইসব ধরনের অনেক উদ্ভিদ আছে যার পদ্ধতি হয়তো আমাদের জানা নেই, যার মধ্যে কিছু ব্যবহার হয় ঔষধ হিসেবে, আবার কিছু ব্যবহার হয় বিষ হিসাবে। আবার এমনও হয় একই উদ্ভিদ দুই ধরনেরই প্রভাব দেখাতে পারে। যেমন 'ইংরাজি ইউ বেরি' মানুষ বা জন্তু খেলে সেটা খুবই বিষাক্ত, আবার তার থেকে প্যাক্লিট্যাক্সেল নামে ক্যান্সারের একটি ওষুধও তৈরি হয়েছে।

এই ঐতিহ্যগত জ্ঞানই আমাদের গবেষণার মূল। প্রদাহজনক রোগ নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে আমরা জেনেছি যে আজ পর্যন্ত এইসব রোগের কোন সুরক্ষিত এবং স্থায়ী নিরাময় নেই। অনেক রোগের জন্য ওষুধ তো আছে, যেমন স্টেরয়েড, কিন্তু তার থেকে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় অনেক রোগও হতে পারে, এমনকি অনেক সময় মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। হাঁপানির মত কিছু রোগের ওষুধ হচ্ছে অত্যন্ত দামি। যেমন, 'মনোক্লোনাল এন্টিবডি থেরাপি', যা অনেক দেশে পাওয়া পর্যন্ত যায় না। এই ক্ষেত্রে ফাইটোথেরাপি বা আয়ুর্বেদ থেরাপি একটি সুরক্ষিত বিকল্প যাতে প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করে চিকিৎসা করা সম্ভব।

ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে, "An apple a day keeps the doctor away." কখনো ভেবেছেন কেন? আপেলে আছে বহু ফ্লাভোনয়েড, বিশেষ করে 'ফাইসেটিন'। ফাইসেটিন স্ট্রবেরিতে সবথেকে বেশি মাত্রায় থাকে ঠিকই, কিন্তু আপেল ও আঙ্গুরেও থাকে যথেষ্ট পরিমানে। আমরা দেখেছি যে ইঁদুরকে ফাইসেটিন খাওয়ালে সেটা ইঁদুরের দেহে বেশ কিছু রোগ যেমন হাঁপানি, পেরিটোনাইটিস, ইডিওপ্যাথিক পালমোনারি ফাইব্রোসিস, এটোপিক ডার্মাটাইটিসের মতন প্রদাহজনিত রোগের অনেকাংশে নিরাময় হয়। আমরা এও দেখেছি যে, এটোপিক ডার্মাটাইটিসের ঘা-এর উপর ফাইসেটিন লাগানোর ফলে সেই ঘা কিছুদিনের মধ্যেই কমে গেছে। যদিও এইসব রোগের ওষুধ হিসাবে ফাইসেটিন যথেষ্ট কার্যকরি, যাকে আমরা 'ড্রাগ রিপারপাসিং' বলি। প্রতিটি রোগে তার কাজ করার পদ্ধতি আলাদা।

আগেই বলা হয়েছে পা মচকে গেলে চুন-হলুদ লাগানো একটা প্রচলিত টোটকা। এটার কারণ হচ্ছে কারকিউমিন-এর প্রদাহবিরোধী প্রভাব। এই কারকিউমিন হলুদে উপস্থিত একটি বিশেষ উপাদান। আমরা হাঁপানি ও ইডিওপ্যাথিক পালমোনারি ফাইব্রোসিসে আক্রান্ত ইঁদুরের ওপর কারকিউমিন প্রয়োগ করে দেখছি যে ঐসব রোগ উপশমে এই রাসায়নিক যথেষ্ট কার্যকরী।

তুলসী

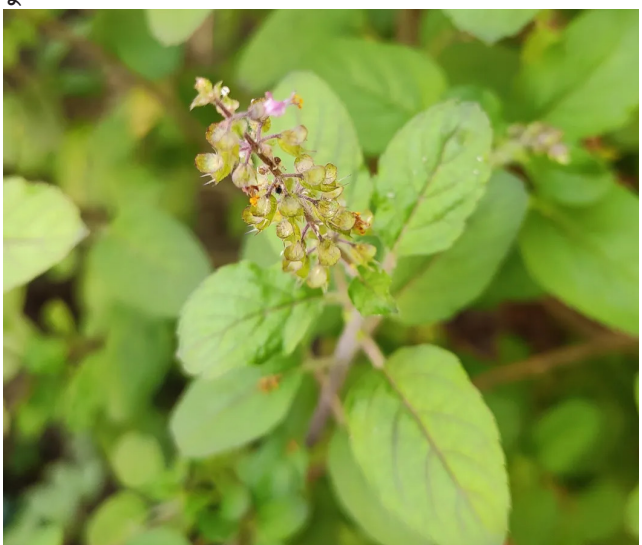

নীম

হলুদ

পান

হাড় ভেঙে গেলে বহু বছর ধরে চলে আসছে হাড়জোর গাছের ব্যবহার। আমরাও এটা ব্যবহার করে দেখছি, তবে ভাঙা হাড়ে নয় রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসে। আর্থ্রাইটিসের জন্য গাঁট ফুলে যে ব্যাথা হয়, আমরা দেখছি হাড়জোর খাওয়ার পর সেটা অনেকটাই কমে গেছে।

কিডনির রোগে অনেক সময় চালকুমড়া খেতে বলা হয়। তার প্রধানতম কারণ এতে এমন কিছু উপাদান থাকে যা রক্তের ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন (BUN), সিরাম ইউরিয়া যেগুলি কিডনি রোগে প্রচন্ড পরিমাণে বেড়ে যায় তা কমিয়ে দিয়ে রোগটা অনেকটাই সারিয়ে তোলে। দীর্ঘস্থায়ী কিডনির অসুখে কিডনির যে ক্ষয় হয় সেটিও সারিয়ে তুলতে সফল হয়েছে এই চালকুমড়ার গোটা ফলের নির্যাস। এ ছাড়া আছে পুনর্ণবা, যেটি একটি ফুলদায়ক উদ্ভিদ, যা ভারতবর্ষে অনেক জায়গায় সবজি হিসেবে খাওয়া হয়।। এই পুনর্ণবাও কিডনির রোগ প্রতিরোধে যথেষ্ট সফল।

বাঙালির জীবন পান ছাড়া অন্ধকার, সে পুজোর কাজেই হোক বা খাওয়ার জন্যই হোক। অনেকের ধারণা পান খেলে ক্যান্সার হয়, এটা ভুল তথ্য। ক্যান্সার হয় সুপুরি আর খয়ের থেকে। পান পাতায় অনেক অপরিহার্য তেল ও অন্যান্য উপাদান আছে যা প্রদাহবিরোধী। পান পাতার এন্টিঅক্সিডেন্ট ও জীবাণুবিরোধী প্রভাবও আছে।। মজার ব্যাপার হলো যে পানের লাভজনক প্রভাব নির্ভর করে পাতাগুলো কোথায় চাষ হয়েছে তার ওপর, কারণ পশ্চিমবঙ্গের প্রতি জেলায় মাটি, আবহাওয়া, জল, সবকিছুর ধরণ আলাদা। এই বৈচিত্র থেকেই আসে পানের কার্যকলাপের বৈচিত্র।

ঋষ্যগন্ধা উদ্ভিদ ভারতীয় উপমহাদেশে বহুল পাওয়া যায় এবং এরও প্রদাহবিরোধী, এন্টিঅক্সিডেন্ট ও জীবাণুবিরোধী প্রভাব আছে। এছাড়াও আর ফলের মধ্যে এমন কিছু উপাদান আছে যা রক্ত থেকে অতিরিক্ত গ্লুকোজ দূরীভূত করতে পারে। দেহের ইনসুলিন উৎপাদনের প্রাথমিক উৎস অগ্নাশয়-এর বিটাকোষ মেরামত করতেও এই ফল সক্ষম। এই থেকে আমাদের ধারণা যে এই ফলটি ডায়াবেটিস রোগ সারাতে সক্ষম হবে।

যদিও পান এবং ঋষ্যগন্ধা নিয়ে আমাদের গবেষণা এখনো চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছায় নি, তবুও পূর্বে উল্লিখিত অন্যান্য ফাইটোকেমিক্যালস ও উদ্ভিদের নির্যাসগুলির উপর আমাদের গবেষণার ফলাফল এমন বেশ কিছু দীর্ঘস্থায়ী রোগের বিকল্প চিকিৎসার কৌশল হিসেবে অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিশীল, যে রোগগুলির এখনো পর্যন্ত কোনো স্থায়ী ও নিরাপদ নিরাময়ের উপায় আমাদের জানা নেই। ●

*__প্রফেসর এণা রায় ব্যানার্জী__ *কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমিউনোবায়োলজি, রিজেনারেটিভ মেডিসিন এন্ড ট্রান্সলেশনাল আউটকামস রিসার্চ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান।*
ইমেল: erb@caluniv.ac.in
__রণিতা দত্ত__ ও __শিঞ্জিনী মিত্র__ *সংশ্লিষ্ট বিভাগের গবেষক।*

হাড়জোড়

ঋষ্যগন্ধা

মহাকাশে অপত্য পুরাণ

তুহিন সাজ্জাদ সেখ

হাত ঘড়িতে সময় দেখছেন— নাহ্! দেখবেন না। ওই ঘড়িতে কেবলমাত্র ঘন্টা, মিনিট ও সেকেন্ডের কাঁটা আছে; কিন্তু সময়তো এখন মিলিসেকেন্ড, মাইক্রোসেকেন্ড এবং ন্যানোসেকেন্ডের এককে মাপা হয়। তাহলে আমরা যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলবো কেমনে! ভাবছেন তো, জ্ঞান দিচ্ছি। মোটেও না। একবার ভেবে দেখুন তো এই ব্রহ্মান্ড সৃষ্টির কথা, আমাদের সৌরজগৎ কিংবা পৃথিবী সৃষ্টির সময়কাল! গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল তাই না। আচ্ছা আমরা কিংবা আমাদেরই কোন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যদি ওই মহাকাশে নতুন কোন সৌরজগৎ, নতুন নতুন তারার জন্ম হতে দেখে, তবে কেমন হবে বলুন তো! হম্ আমি শুধুমাত্র আপনাকে দূরদৃষ্টির উপর ভর দিয়েই ওই মহাজাগতিক আনন্দপট অবলোকন করতে বলব। অবশ্যই আমি এবিষয়ে আপনাকে সঙ্গ দেব, কিন্তু তার আগে চলুন টাইম মেশিনে চড়ে একটু বেড়িয়ে আসি 1000 কিংবা 500 খ্রীস্টপূর্বাব্দের সেই নর্স বা নর্ডিক পুরাণকালের জার্মান দেশে।

মনে পড়ে, পৌত্তলিক জার্মান ধর্মসংস্কৃতির সেই বিখ্যাত দেবতা থরের কথা। নর্স পুরাণে থর হলেন একজন হাতুড়ি-ধারী দেবতা, যাকে "থরস্ হেলমেট" বলা হয়ে থাকে। তিনি বজ্রবিদ্যুৎ, ঝড়, ওক গাছ, শারীরিক শক্তি, মানবজাতির সুরক্ষা এবং প্রথাগত পবিত্রকরণ অনুষ্ঠান, আরোগ্য ও উর্বরতার দেবতা। ওই বিখ্যাত উত্তর জার্মাণীয় দেবতা থর, পৌরাণিক রোমানীয় জনমানসের বজ্রপাত বা থান্ডারের দেবতা "জুপিটারে"র সমতুল্য। এই দুই থান্ডারের দেবতার নাম অনুসারেই "থরস্ ডে" কথাটি এসেছে এবং যা বর্তমান সময়কালে সপ্তাহের চতুর্থ দিন 'থার্স ডে' বলে প্রচলিত। ভারতবর্ষের সংস্কৃতিতে এই দিনটি বৃহস্পতিবার বলে নামাঙ্কিত; বৃহস্পতি অর্থাৎ দেবতাদের পতি বা গুরু। এখন এই বৃহস্পতি থরের 'হেলমেট' নাকি ব্রহ্মান্ডে প্রসবপীড়ায় ভুগছে!

আবারো ভাবছেন, আমি বুঝি হেঁয়ালি করছি। নাহ্; সত্যিই আমি কিন্তু খুব সিরিয়াস! ইংরেজিতে ফার্টিলিটি বা বাংলায় উর্বরতার দেবতা থরের 'হেলমেট' সত্যিই পোয়াতি! জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অন্ততঃ তাই ধারনা। আন্তর্জাতিক গবেষণায় উঠে এসেছে ওই বিচিত্র নিসর্গের বুকে "থরস্ হেলমেট" নামে একটি নীহারিকার মধ্যে সমূহ সুপারনোভার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সুপারনোভা হলো সেই মহাজাগতিক বিকট ঝঞ্ঝা যেখানে দৈত্য নক্ষত্রের পতন হয় এবং অপত্য তারাদের জন্ম হয়। ওই মহাশূন্যেই জমাট হয়ে রয়েছে যতসব জন্মমৃত্যু রহস্য!

তারায় ভরা আকাশের বুকে রয়েছে বহু সংখ্যক তারামন্ডল বা নক্ষত্রপুঞ্জ, ইংরেজিতে যাকে বলে কনস্টেলেশন; সেইরকমই একটি নক্ষত্রপুঞ্জ হলো "ক্যানিস মেজোর" বা জ্যোতির্বিদ্যার পরিভাষায় অনেক সময় "দ্য গ্রেট ডগ/ওভারডগ" বলেও চিহ্নিত। এই নির্দিষ্ট তারামন্ডলের মধ্যেই অবস্থিত "থরস্

ক্যানিস মেজোর তারামন্ডল

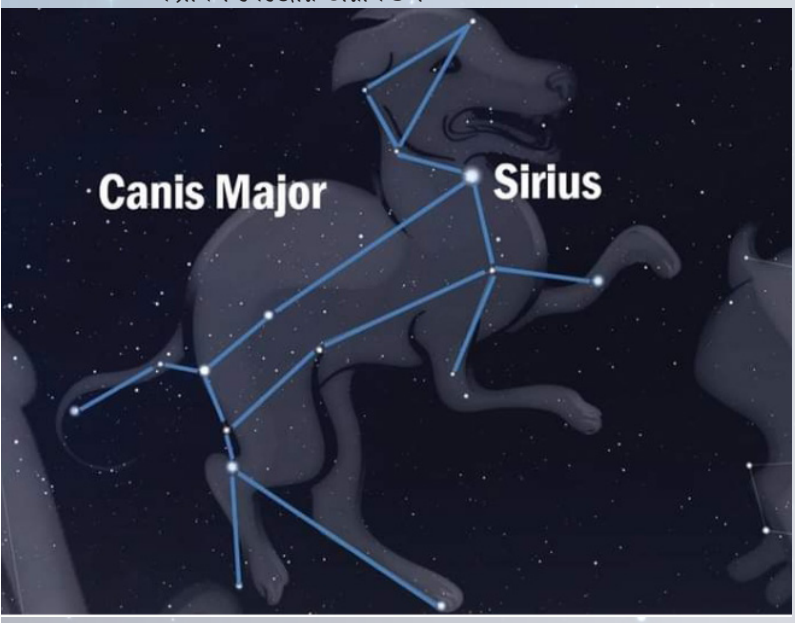

থরস্ হেলমেট নীহারিকা

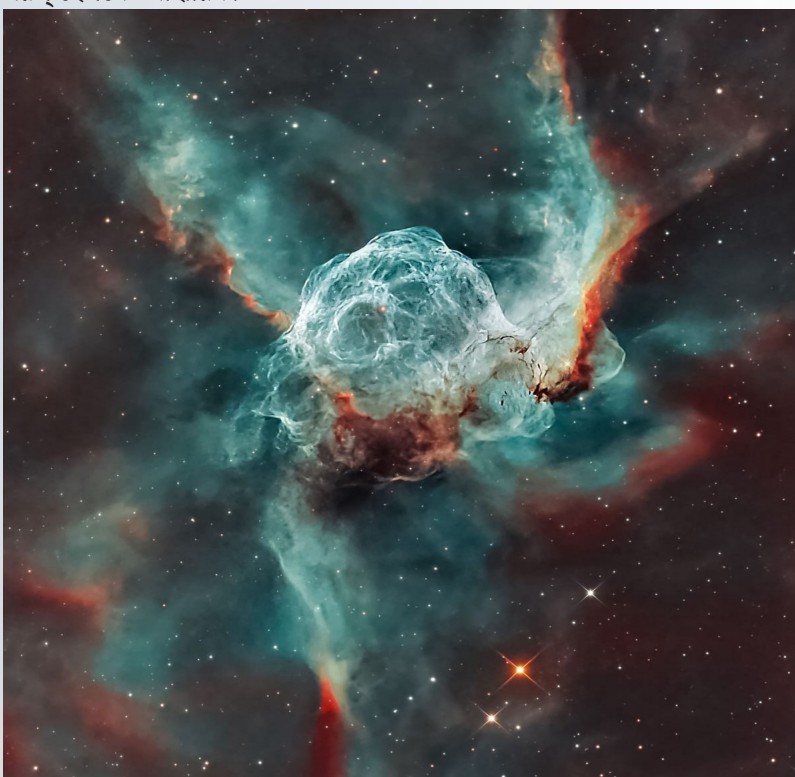

দেবতা থর ও তাঁর বিখ্যাত হ্যামার

হেলমেট” নামে নীহারিকা টি। নীহারিকাটি দেবতা থরের হেলমেটের মতো দেখতে এবং আকারেও বিশাল তাই এইরূপ নামকরণ। সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র সিরিয়াস বা দ্য ডগ স্টার সহ আটটি মূল শ্রেণীর নক্ষত্র বিশিষ্ট এই তারামন্ডলটি নাকি দ্বিতীয় শতকে বিজ্ঞানী টলেমির চিহ্নিত করা আটচল্লিশটি তারামন্ডলের একটি। তবে আধুনিক মহাকাশ বিজ্ঞানের তথ্য অনুযায়ী এই নক্ষত্রপুঞ্জটিকে বর্তমান 88 টি নক্ষত্রপুঞ্জের একটি বলে গণ্য করা হয়। এর বিপরীত দিকে অবস্থিত প্রায় সদৃশ তারামন্ডলটিকে “ক্যানিস মাইনর” বা দ্য লেসার ডগ বলে চিহ্নিত করা হয়। মহাকাশের দক্ষিণ প্রান্তে উপস্থিত এই “ক্যানিস মেজোর”-এর বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি রবার্ট ফ্রস্ট একদা লিখেছেন, “দ্য গ্রেট ওভারডগ, দ্যাট হেভেনলি বিস্ট/ উইদ এ স্টার ইন ওয়ান আই, গিভস্ এ লিপ ইন দ্য ইস্ট/ হি ডান্সেস আপরাইট অল দ্য ওয়ে টু দ্য ওয়েস্ট/ অ্যান্ড নেভার ওয়ান ড্রপস্ অন হিস ফোরফিট টু রেস্ট/ আই অ্যাম এ পুওর আন্ডারডগ, বাট টুনাইট আই উইল বার্ক/ উইদ দ্য গ্রেট ওভারডগ দ্যাট রম্পস্ থ্রু দ্য ডার্ক।”

ওই অন্ধকার রাতের আকাশে তারাদের ঝিকিমিকি সত্যিই রোমাঞ্চকর, শিউরে ওঠার মতো! ঠিক যেমন “থরস্ হেলমেট”-এর শিশু নক্ষত্রের জন্ম দেওয়ার রটনা টি। থরস্ হেলমেট হলো আদতে একটি নীহারিকা, যাকে জ্যোতির্বিদ্যার পরিভাষায় NGC 2359 হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এটি দেবতা থরের সেই সুবিশাল হাতুড়ির মতো টুপির আকারের একটি বৃহত্তর মহাজাগতিক মেঘজটলা, যার আবার ডানার মতো উপাঙ্গ রয়েছে। এটি ওই বৈচিত্র্যময় নিসর্গের দক্ষিণতম গোলার্ধে ক্যানিস মেজোর তারামন্ডলের অন্তর্গত একটি নির্গমন নীহারিকা। একটি নির্গমন নীহারিকা হল আয়নিত গ্যাস দ্বারা গঠিত একটি নীহারিকা যা বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো নির্গত করে। আয়নকরণের সবচেয়ে সাধারণ উৎস হল উচ্চ-শক্তির অতিবেগুনী ফোটন বা আলোক কণা যা নিকটবর্তী কোনো গরম নক্ষত্র থেকে নির্গত হয়।

ক্যানিস মেজোর তারামন্ডলের মধ্য দিয়েই পৃথিবীর ছায়াপথ দ্য মিল্কি ওয়ে প্রবাহিত হয়, এবং এই তারামন্ডলের সীমান্তে বহুসংখ্যক মুক্ত মেঘজটলার দেখা মেলে। পৃথিবীর ছায়াপথ থেকে প্রায় এগারো হাজার ন’শ বাশট্টি আলোকবর্ষ বা তিন হাজার ছ’শ সত্তর পারসেক দূরে অবস্থিত এই বিশেষ হেলমেট নীহারিকাটি। এই নীহারিকাটি আবার ওই তারামন্ডলের শীর্ষস্থানের দিকে প্রায় পনেরো হাজার আলোকবর্ষ দূরে অবস্থান করছে এবং এর বিস্তার প্রায় ত্রিশ আলোকবর্ষ দূরত্ব ব্যাপী। “O” আকারের দেখতে কোমল এই নীহারিকা টির মস্তকদেশে উষ্ণ বায়ুর স্রোতের ফলে সঞ্চিত নুড়ি থেকে সৃষ্ট বুদবুদ নীহারিকা বা বাবল্ নেবুলা দেখা যায়। এই বিশেষত্বের জন্য এই নীহারিকা টিকে বাহ্যিকভাবে দেখতে একটি উজ্জ্বল গ্যাসীয় পিন্ড বলে মনে হয়।

একটি উজ্জ্বল, বিচ্ছুরিত আলো কখনও কখনও কোন একটি নক্ষত্রের সাথে যুক্ত থাকে যার তাপমাত্রা 20,000 কেলভিন-এর বেশি। এই ধরনের বায়বীয় অঞ্চলে পর্যবেক্ষণ

বুদবুদ নীহারিকা বা বাবল্ নেবুলা

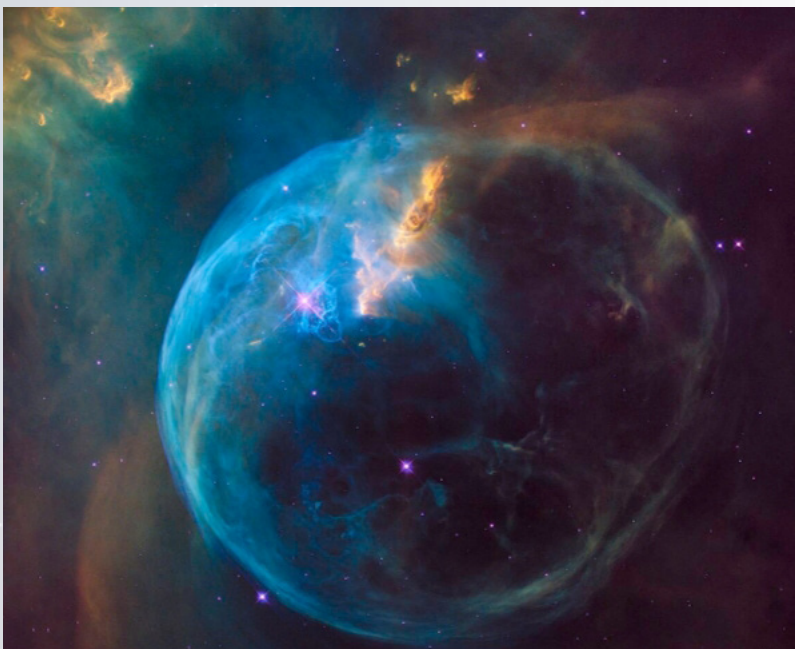

করা অপটিক্যাল এবং রেডিও শক্তি প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় উত্তেজনা প্রক্রিয়াটি দীর্ঘ একটি জ্যোতির্বিজ্ঞানের ধাঁধা ছিল। বহু গবেষণার পর এটি পাওয়া গেছে যে, তারা থেকে অতিবেগুনী আলো কাছাকাছি আয়নিত হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম পরমাণু থেকে আসে। এখন বিভিন্ন ধরণের নির্গমন নীহারিকাগুলির মধ্যে রয়েছে এমনই একটি অংশ যা "H II অঞ্চল" বলে পরিচিত। একটি H II অঞ্চল হলো আন্তঃনাক্ষত্রিক পারমাণবিক হাইড্রোজেনের একটি অঞ্চল যা আয়নিত গ্যাসে পূর্ণ। এটি সাধারণত আংশিক আয়নিত গ্যাসের একটি অংশ যা একটি আণবিক মেঘের মধ্যে যেখানে সম্প্রতি তারার গঠন ঘটেছে, সেখানে অবস্থান করে। এর আকার এক থেকে কয়েকশ আলোকবর্ষ এবং ঘনত্ব প্রায় এক মিলিয়ন কণা প্রতি ঘন সেন্টিমিটার। 1610 খ্রীস্টাব্দে বিজ্ঞানী নিকোলাস-ক্লদ ফ্যাব্রি দে পিরেস্ক টেলিস্কোপের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং নীহারিকার কেন্দ্রীয় অঞ্চলে এই ধরনের বিষয়বস্তু আবিষ্কৃত হয়েছিল। যেখানে তারার গঠন হচ্ছে এবং যেখানে একটি মৃত নক্ষত্র তার বাইরের স্তরগুলিকে ছুঁড়ে ফেলেছে, উন্মুক্ত গরম কোরটি তারপরে তাদের পুনরায় আয়নিত করছে। এভাবেই চলছে জন্ম মৃত্যু খেলা।

কেন্দ্রস্থলে WR7 নক্ষত্রের উজ্জ্বল উপস্থিতি

এখন বিভিন্ন ধরণের নির্গমন নীহারিকাগুলির মধ্যে রয়েছে এমনই একটি অংশ যা "H II অঞ্চল" বলে পরিচিত।

মহাশূন্যে উপস্থিত নির্গমন নীহারিকার কেন্দ্রস্থলে প্রবল তাপ ও চাপের দরুন ঘটিত এই পীড়ার নামই সুপারনোভা। বিজ্ঞানীদের ধারণা আগামী কয়েকশ বছরের মধ্যেই "থরস্ হেলমেট" নীহারিকাটির মধ্যে ঘটতে চলেছে সুপারনোভা। তৈরি হতে পারে অপত্য পুরাণ! মহাকাশ জুড়ে নতুন নতুন শিশু নক্ষত্রের সমারোহ। এই হেলমেট নীহারিকাটির কেন্দ্রে রয়েছে দ্য ওল্ফ-রায়েত নক্ষত্র WR7, যা নিসর্গবিদদের ভাষায় HD56925 নামেও পরিচিত। এই নক্ষত্রটির মধ্যে আয়নিত হিলিয়াম, নাইট্রোজেন ও কার্বন কণার অস্বাভাবিক আলোকচ্ছটার নির্গমন রেখা পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং এর কেন্দ্রীয় তাপমাত্রা 25000 কেলভিনেরও বেশি হয়ে গেছে। মহাকাশ বিজ্ঞানীদের ধারণা এই নীহারিকাটি তার নিকট প্রাক-সুপারনোভা স্থিতিতে বিরাজ করছে; আগামীদিনে নিশ্চিত বিস্ফোরণ ঘটবে এবং নতুন তারার সৃষ্টি হবে।

আমেরিকার ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা নাসার পক্ষ থেকে গত ৯ই জানুয়ারী এই বিশেষ "থরস্ হেলমেট" নীহারিকাটির ছবি প্রকাশ করে নতুন তারা সৃষ্টির জল্পনাকে একপ্রকার উস্কে দিয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। মানুষজন অনুভব করতে পারছেন বড় বিচিত্র এই বিশ্বব্রহ্মান্ড; পরতে পরতে তাঁর রহস্য। তাই কবি হয়তো ঠিকই বলেছেন, "যেতে হবে মহাকাশে ফের / অসীমে সময় থাকে ঢের.... / মহাশূন্যে তুই আর আমি / দুজনেই পাগলামি পাকামি।"

লেখক ***শ্রী তুহিন সাজ্জাদ সেখ*** *লোকবিজ্ঞান কর্মী ও জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক। ইমেল:* sk.sajjadtuhin14@gmail.com

যারা আলো জ্বেলেছিল (পর্ব – ১৩)

অরুণাভ দত্ত

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে মানুষের অগ্রগতি সমানুপাতিক। বিজ্ঞান যত এগিয়েছে ততই বদলেছে মানুষের জীবনযাত্রা, সভ্যতার স্বরূপ। শুরুটা হয়েছিল বেঁচে থাকার লড়াই দিয়ে। সে লড়াই আজও থামেনি। চলছে পৃথিবীর অবর্তমানে অন্য গ্রহে মানবসভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার প্রয়াস। গ্যালিলিওর টেলিস্কোপ থেকে আদিত্য-এল 1, দ্রুততার সঙ্গে মানুষ পৌঁছেছে উন্নতির শিখরে এবং বিজ্ঞানের এই উত্তরণ সম্ভব হয়েছে একমাত্র তাঁদের জন্যই যাঁরা অন্ধকার পৃথিবীর বুকে প্রথম বিজ্ঞানের আলো জ্বেলেছিল।

এবার ফিরে আসি প্রাচীন ভারতবর্ষে। বিদ্যোৎসাহী রাজাদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে কৌটিল্য বা চাণক্যকে দিয়ে শুরু করেছিলাম। সেই কৌটিল্যের লেখা ‘অর্থশাস্ত্র’ থেকে আমরা জানতে পারি, খ্রিস্টাব্দ শুরু হওয়ার ঠিক আগের কয়েক শতাব্দীতে মৌর্য রাজাদের আমলে শাসনতন্ত্র, কৃষি, বাণিজ্য, বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটেছিল। জানা যায়, সে সময় যুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে কাজে লাগত নানা ধরনের যন্ত্র। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে আমরা আরও জানতে পারি যে, সেই আমলে কৃষির বিকাশ এতদূর হয়েছিল যে, এতে কৃত্রিম সেচের প্রয়োজন হত। অর্থশাস্ত্রে খাল ও জলাধারের উল্লেখ রয়েছে। এসব বানাতে যথেষ্ট প্রযুক্তিগত দক্ষতার প্রয়োজন হত। দৈনন্দিন কাজে লাগে এমন সরঞ্জামের মধ্যে ছিল, গরমকালে বাতাস ঠান্ডা করার জন্য চারদিকে ঘুরিয়ে জল ছিটোবার এক সরঞ্জাম। সেই সময় শিল্প ও ভাস্কর্যতেও ভারত অনেক উন্নতি লাভ করেছিল। মৌর্য রাজবংশের তৃতীয় সম্রাট ধর্মপ্রাণ অশোক নির্মাণ করিয়েছিলেন পশু চিকিৎসাকেন্দ্র। অশোকের আমলে স্থাপত্যেও ভারত অনেক উন্নতি লাভ করেছিল। অশোকের জমকালো রাজপ্রাসাদ দেখে চিনা পর্যটক ফা-হিয়েনের মনে হয়েছিল যে, এই প্রাসাদ তৈরি করেছে অশোকের সেবায় নিয়োজিত এক দল অশরীরী। অর্থাৎ সে আমলে ভারত শিল্প, স্থাপত্যচর্চায় এতখানি উন্নতি করেছিল যে, সে সব মানুষ নির্মাণ করতে পারে বলে ফা-হিয়েনের বিশ্বাস হয়নি।

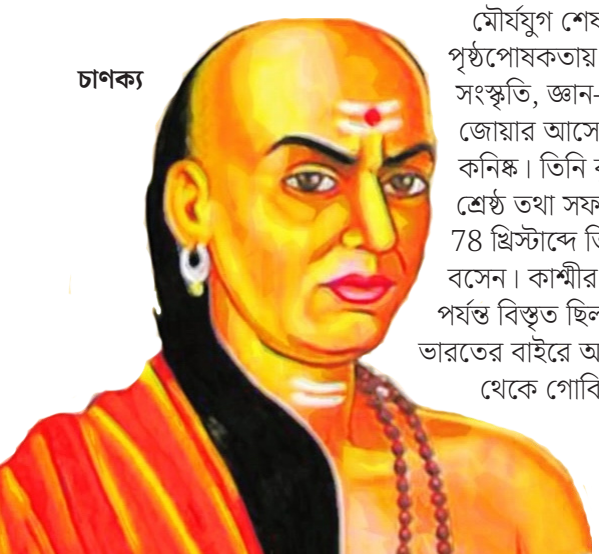

চাণক্য

মৌর্যযুগ শেষ হলে যে রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতে শিল্প, সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় জোয়ার আসে, তিনি হলেন কনিষ্ক। তিনি কুষান বংশের শ্রেষ্ঠ তথা সফলতম রাজা। 78 খ্রিস্টাব্দে তিনি সিংহাসনে বসেন। কাশ্মীর থেকে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাঁর ভারতরাজ্য। ভারতের বাইরে আফগানিস্তান থেকে গোবি মরুভূমি পর্যন্ত ভূখণ্ড তাঁর শাসনাধীন ছিল বলে মনে করা হয়। তবে রাজ্যবিস্তারের চেয়ে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার এবং শিল্প-সংস্কৃতিচর্চার প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল অধিক। ভিনসেন্ট স্মিথ তাঁর বুদ্ধানুরাগের জন্য তাঁকে ‘দ্বিতীয় অশোক’ বলেছেন। কনিষ্কের আমলে বৌদ্ধধর্মে ‘মহাযান’ ও ‘হীনযান’ নামে দুটি মতের জন্ম হয়েছিল। কনিষ্কের রাজত্বকালেই কাশ্মীরে আয়োজিত হয়েছিল চতুর্থ বৌদ্ধ সংগীতি। বৌদ্ধধর্মের প্রচারের জন্য কনিষ্ক অনেক বিহার, চৈত্য ও সংঘারাম নির্মাণ করান। সে সব থেকে কুষান যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। বৌদ্ধ দার্শনিক ও নাট্যকার অশ্বঘোষ তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করেন।

অশোক

কারও কারও মতে কনিষ্কের আমলে আবির্ভাব হয়েছিল চিকিৎসাবিদ চরক এবং রসায়নবিদ নাগার্জুনের। চরক যে আয়ুর্বেদ সংহিতা রচনা করেন, তা ‘চরক সংহিতা’ নামে বিখ্যাত। চরক তাঁর সংহিতায় খনিজ, প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ দ্রব্যাদির গুণাগুণ বিশ্লেষণ করেছেন। রোগের উৎপত্তি এবং রোগ আরোগ্যের নিদান দিয়েছেন। পরবর্তীকালে চরকের সংহিতা বিষয়ে বহু টীকা ও ভাষ্য রচিত হয়েছে। পণ্ডিতদের অভিমত, ভারতবর্ষে রসায়নবিজ্ঞানে গবেষণার সূত্রপাত নাগার্জুনের হাতেই। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম ‘রসরত্নাকর’। ওই গ্রন্থে পারদ সম্বন্ধে নানা পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে। শোনা যায়, আরবের পণ্ডিতরা নাগার্জুনের রচনা থেকে বহু তত্ত্ব ও তথ্য আহরণ করেছিল।

গুপ্ত রাজাদের আমলে ভারতের দুই উজ্জ্বল বিজ্ঞানজ্যোতিষ্ক ছিলেন আর্যভট্ট ও বরাহমিহির। গুপ্ত যুগে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে দিল্লীর লৌহস্তম্ভটি তৈরি হয়, যেটি বহু পুরনো হয়ে গেলেও মরচে না পড়ার জন্য বিখ্যাত হয়ে আছে। প্রাচীন ভারতের রাজাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার উৎসাহদানের সবচেয়ে বড় দুটি উদাহরণ হল নালন্দা ও বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়। বিক্রমশীলা

চরক

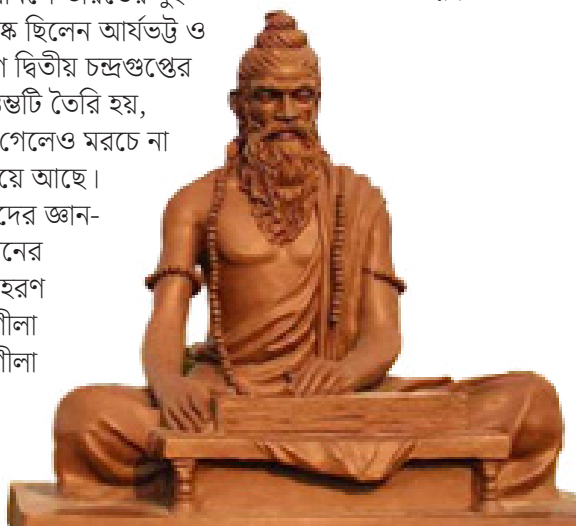

নাগার্জুন

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা পাল বংশের রাজা ধর্মপাল (770–810 খ্রিস্টাব্দ)। নালন্দা কবে, কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। তবে অষ্টম শতকে পাল রাজাদের এবং সুমাত্রার শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল নালন্দা। চিনা পরিব্রাজক হিউয়েন-সাং নালন্দার খবরাখবর দিয়েছেন। জানা যায়, দেশ-বিদেশের প্রায় দশ হাজার শিক্ষার্থী নালন্দায় পড়াশোনা করত। নানা বিষয় পড়ানোর জন্য জ্ঞানী-গুণী অধ্যাপকরা ছিলেন। হিউয়েন-সাঙের সময় নালন্দার অধ্যক্ষ ছিলেন একজন বাঙালি, তাঁর নাম শীলভদ্র। তিনি ছিলেন জ্ঞানের সমুদ্র, সর্বশাস্ত্রবিশারদ। বড় বড় রাজা, এমনকী সম্রাট হর্ষবর্ধন (606–647 খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত তাঁর নাম শুনে শ্রদ্ধায় নতশির হতেন। জানা যায়,

চিনা পরিব্রাজক হিউয়েন-সাং নালন্দার খবরাখবর দিয়েছেন। জানা যায়, দেশ-বিদেশের প্রায় দশ হাজার শিক্ষার্থী নালন্দায় পড়াশোনা করত।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত

নালন্দা এবং বিক্রমশীলা দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিনা বেতনে পড়াশোনা করতে পারত। বিশ্ববিদ্যালয় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বহু ধনী ব্যক্তি এবং রাজপুরুষ মুক্তহস্তে দান করতেন। বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার-পণ্ডিত ছিলেন বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং নৈয়ায়িক শান্তি রত্নাকর। তাঁর শিষ্য ছিলেন অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। বিক্রমশীলায় পড়াশোনা করতে হলে শিক্ষার্থীদের সর্বপ্রথম দ্বার-পণ্ডিত রত্নাকরের কাছে অ্যাডমিশন টেস্ট দিতে হত। শিক্ষার্থীরা বিদ্যাবুদ্ধি, স্বভাবচরিত্র সমস্ত দিক দিয়ে উন্নত হলে তবেই সেখানে ভর্তি হওয়ার ছাড়পত্র পাওয়া যেত।

দিল্লীর লৌহস্তম্ভ

সুলতানি যুগে বিদ্যোৎসাহী সুলতান হিসেবে উঠে আসে ফিরুজ শাহ তুঘলকের নাম। 1351 সালে মহম্মদ-বিন-তুঘলকের মৃত্যুর পর আমির-ওমরাহ ও উলেমাদের সমর্থনে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ফিরুজ শাহ তুঘলক দিল্লির সুলতান হন। ফিরুজ শাহ তুঘলক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় গ্রন্থকে ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করান। সেই সময় কিছু কিছু গ্রন্থাগার সাধারণ মানুষদের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। যেমন, ফিরুজ তুঘলক তাঁর শাহী গ্রন্থাগারে জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক প্রচুর বই এবং অ্যাস্ট্রোলেব সংগ্রহ করেছিলেন এবং চেয়েছিলেন যে, আগ্রহী ব্যক্তিদের কাছে এগুলি সহজলভ্য হোক। তিনি কতকগুলি বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

আকবর

দিল্লির দরবারে গ্রিক ধারার চিকিৎসাপদ্ধতি প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফিরুজ শাহ তুঘলকের নেতৃত্বে 'তিব্ব ই ফিরোজশাহী' নামে চিকিৎসাবিজ্ঞানের উপর একটি কোষগ্রন্থ রচিত হয়। ফিরুজ শাহ তুঘলক একটি হাসপাতাল স্থাপন করেছিলেন। সেখানে সাধারণ মানুষের চিকিৎসা হত। তিনি মানসিক রোগে অসুস্থ মানুষদের হাসপাতালে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন।

আকবরের সভাকবি ফৈজী ভাস্করাচার্যের বিখ্যাত গ্রন্থ 'লীলাবতী'-র ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করেন।

মুঘল সম্রাট আকবরের দরবারে অঙ্ক ও জ্যোর্তিবিদ্যাচর্চায় যথেষ্ট নজর দেওয়া হত। আকবরের সভাকবি ফৈজী ভাস্করাচার্যের বিখ্যাত গ্রন্থ 'লীলাবতী'-র ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করেন। পারস্য থেকে আগত ফাতুল্লাহ্ শীরাজী অঙ্ক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন বলে তিনি মুঘল দরবারে সমাদর পেয়েছিলেন। তাঁকে একটি নিখুঁত সৌর বর্ষপঞ্জী তৈরির বরাত দেওয়া হয়েছিল। 'ইলাহী' নামে এই বর্ষপঞ্জীটি 1584 খ্রিস্টাব্দে বাদশাহী আইন দ্বারা বলবৎ করা হয়। আকবরের আমলে আবিষ্কৃত হয় গিয়ার লাগানো চাকা। এ ছাড়াও আকবরকে সোরা (Salt petre) দিয়ে জল ঠান্ডা করবার জনপ্রিয় পদ্ধতি উদ্ভাবনের কৃতিত্বও দেওয়া হয়।

ফিরুজ শাহ তুঘলক

জাহাঙ্গিরের স্মৃতিকথা 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরি' থেকে জানা যায় যে, সম্রাট জাহাঙ্গির একজন পক্ষী বিশারদ ছিলেন। এমনকি প্রাণীজগৎ ও উদ্ভিদজগতের খবরাখবরও রাখতেন।

রাজস্থানের জয়পুর শহরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মহারাজা দ্বিতীয় জয়সিংহ। জয়সিংহ যখন অম্বরের সিংহাসনে বসেন তখন থেকেই ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে তাঁর মৈত্রী সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জানা যায়, তিনি মারাঠাদের যুদ্ধে পরাজিত করে বিশালগড় দুর্গ দখল করলে সম্রাট খুশি হয়ে তাঁকে 'সোয়াই' উপাধি দেন। 'সোয়াই' কথার অর্থ এমন একজন মানুষ যে একজনের থেকে এক চতুর্থাংশ বেশি। রাজা জয়সিংহ গণিতবিদ ছিলেন এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানচর্চায় তাঁর উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। তিনি পর্তুগাল, আরব ও ইউরোপ থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন

জাহাঙ্গির

মহারাজা দ্বিতীয় জয়সিংহ

গ্রন্থ ও সংগ্রহ করেছিলেন। রাজা জয়সিংহ জয়পুর স্থাপন করে সেখানে একটি মানমন্দির নির্মাণ করেন। তার পর একে একে দিল্লি, মথুরা, উজ্জয়িনী ও বারাণসীতেও স্থাপিত হয় মানমন্দির। জয়সিংহের যন্তর মন্তর নামে সেগুলি আজও বিখ্যাত। সেই যুগে মহাকাশ পর্যবেক্ষণের জন্য ইউরোপে ছোট ছোট পিতলের যন্ত্র ব্যবহৃত হত। জয়সিংহ তার পরিবর্তে সমরখন্দের উলুঘ বেগের স্থাপত্য শিল্পের অনুকরণে ইট, চুন, সুরকি দিয়ে বিশাল যন্ত্রাদি নির্মাণ করান। তাঁর বিশ্বাস ছিল ছোট যন্ত্রে ভুল-ত্রুটির পরিমাণ বেশি হয়।

তিনি ডেলা হায়ার (de la Hire) এর সারণী আনিয়ে তা থেকে একটি প্রতিসরণ সারণী তৈরি করেন। তিনি দাবি করেছিলেন যে, হায়ার-এর সারণীর থেকে তাঁর পরীক্ষার ফলাফল বেশি নিখুঁত ছিল। তাঁর উদ্ভাবিত বিখ্যাত তিনটি যন্ত্র হল—সম্রাট যন্ত্র, রামযন্ত্র ও জয়প্রকাশ। এগুলির মধ্যে সম্রাট যন্ত্র আদপে সূর্যঘড়ি, যা অর্ধেক মিনিট পর্যন্ত সঠিক সময় নির্ধারণ করতে পারে। তবে জয়সিংহের জ্যোতির্বিজ্ঞানচর্চা ছিল মূলত পর্যবেক্ষণমূলক।

জয়সিংহের মহাবিশ্ব সম্পর্কে ধারণা ছিল সম্পূর্ণ টলেমির ধারণা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

পৃথিবীর নানা প্রান্তের নানা বিদ্যোৎসাহী, জ্ঞানপিপাসু সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় এভাবেই জ্বলে উঠেছিল বিজ্ঞানচর্চার আলো। চাণক্য একটি শ্লোকে বলে গিয়েছেন—

রাজা জয়সিংহ জয়পুর স্থাপন করে সেখানে একটি মানমন্দির নির্মাণ করেন। তার পর একে একে দিল্লি, মথুরা, উজ্জয়িনী ও বারাণসীতেও স্থাপিত হয় মানমন্দির। জয়সিংহের যন্তর মন্তর নামে সেগুলি আজও বিখ্যাত।

বিদ্বত্ত্বঞ্চ নৃপতঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে।।

শ্লোকের অর্থ অনুযায়ী বিদ্বান আর রাজা কখনই সমতুল্য হতে পারেন না। কারণ রাজার কদর তাঁর দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও বিদ্বান ব্যক্তি জগতের সর্বত্র সংবর্ধিত হন।

কিন্তু বিজ্ঞানপ্রেমী রাজারা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, রাজাও যদি হন বিদ্যোৎসাহী, রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে যদি থাকে জ্ঞানের আলো বিতরণের ইচ্ছা, তা হলে তিনি দেশ, কালের সীমানা পেরিয়ে সর্বজনবন্দিত হয়ে থাকবেন।

*লেখক **শ্রী অরুণাভ দত্ত** জনপ্রিয় কল্পবিজ্ঞান লেখক এবং বিজ্ঞানকর্মী। ইমেল: wrarunabha18@gmail.com*

যন্তর মন্তর, জয়পুর

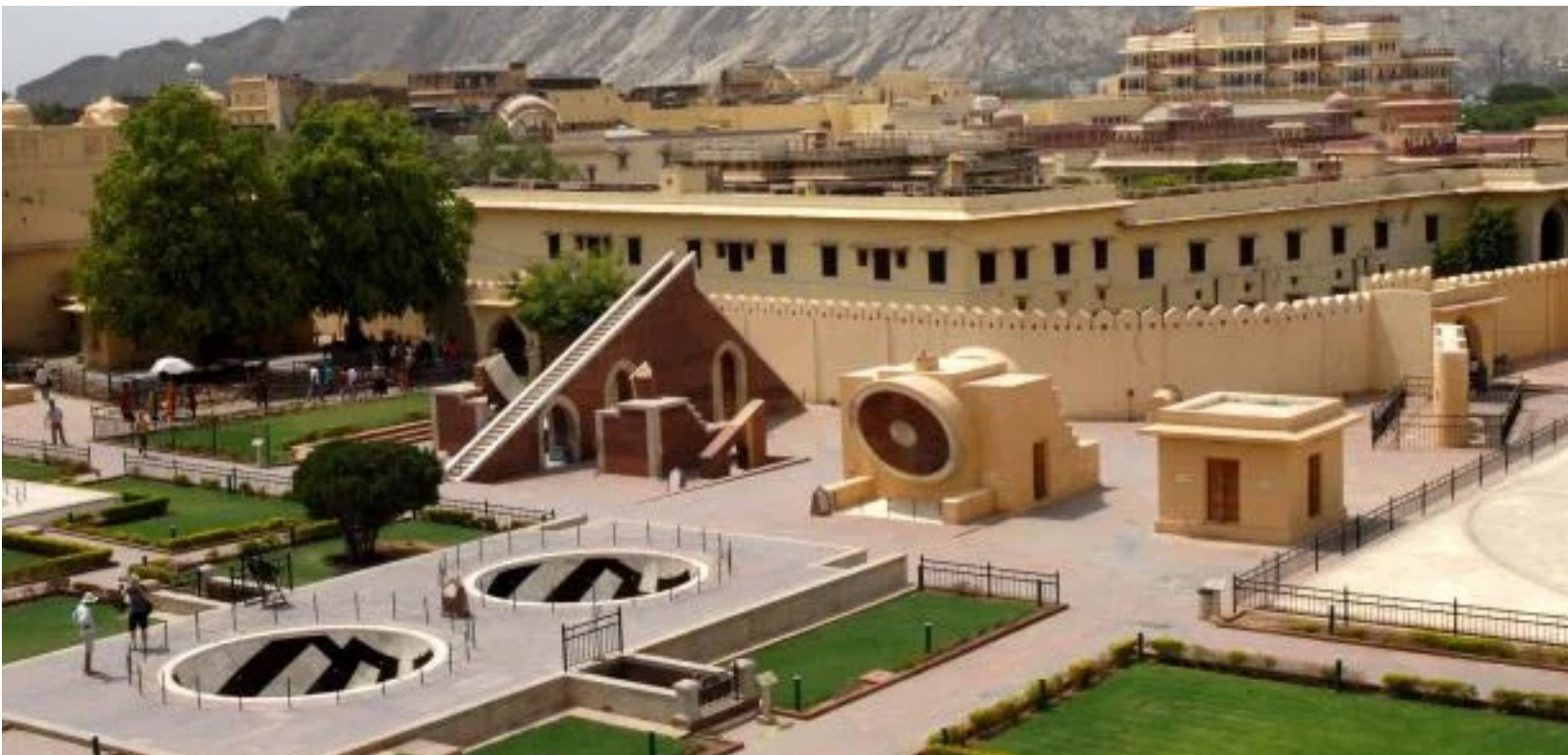

জিরিয়া পাখি

তাপস কুমার দত্ত

পাখির ছবি তুলতে গিয়ে একদিন দেখা পেলাম বালির উপর দিয়ে দ্রুত একটা পাখি ছুটে চলেছে, আবার কখনও কিছু সময়ের জন্য স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে পাখিটি। অদ্ভুত এই আচরন দেখে বড়ই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। অনেক দূর থেকে দেখার জন্য কম আলোতে ঠিক বুজতে পারছিলাম না এটা ঠিক কি পাখি আছে। কাছাকাছি এসে যখন পৌঁছালাম তখন বুজতে পারলাম এটা হলো Little Ringed Plover, বাংলায় যাকে জিরিয়া পাখি বলে থাকি। এই পাখির বৈজ্ঞানিক নাম হলো *Charadrius dubius*.

যে সমস্ত নদী, পুকুর, ঝিল, অগভীর জলাশয় বা নদীর পাড়ে বালুর চর আছে সেই সমস্ত জায়গাতে এই পাখির দেখা মিলতে পারে। এই রকম পরিবেশ বা জায়গা এই পাখিদের খুব পছন্দের জায়গা। এছাড়া অনেক সময় মাঠে ও ফাঁকা জমিতেও এদের দেখা মিলতে পারে।

আকারে ছোটো এই পাখি দেখতে খুবই সুন্দর হয়ে থাকে। এদের কালো গোলাকৃতি বড় চোখের চারপাশে হলুদ রঙের একটা বলয় থাকে, মনে হবে যেন এই পাখির চোখে কেউ হলুদ ফ্রেমের রোদ চশমা পড়িয়ে দিয়েছে। গলার দিকে যদি একটু লক্ষ্য করা যায় তবে দেখা যাবে সাদা ও কালো রঙের একটা পটি যেন ওর গলায় মাপলারের মতন জরিয়ে আছে। কালো পটি কপালের দুপাশে চোখ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। দেহের উপরের অংশের রঙ হালকা বাদামী রঙের এবং দেহের সামনের দিকের অংশ সাদা রঙের হয়ে থাকে। এই পখির কালো ঠোঁট দুটি দেহের আকারের তুলনায় একটু ছোটই হয়ে থাকে। এই পাখি আকারে খুব একটা বেশী বড় হয় না, লম্বায় সাধারনত 15–17 সেন্টিমিটার হয়ে থাকে। এদের পা দুটি হলুদ রঙের হয়ে থাকে এবং পা দুটি খুবই মজবুত হয়। দিনের বেশিরভাগ সময় এরা হেঁটে বেড়াতেই ভালোবাসে, উড়তে এদের খুবই কম দেখা যায়। বালির উপর দিয়ে এরা খুব দ্রুত গতিতে দৌঁড়ায়। এরা যখন এক জায়গা থেকে আর এক জায়গাতে স্থান পরিবর্তন করে উড়ে যায় তখন স্ত্রী জিরিয়া পাখি সকল সময়ের জন্য পুরুষ পাখিকে সঙ্গে নিয়ে যায়। যখন এরা বালির উপর বা মাটির উপর দিয়ে হাঁটে তখন এদের হাঁটার গতি প্রায় ঘন্টায় প্রায় 20–25 কিলোমিটার হয়ে থাকে। যখন এরা উড়ন্ত অবস্থাতে থাকে তখন এদের উড়ার গতিবেগ আরো অনেক বেশী, ঘন্টায় প্রায় 50–60 কিলোমিটার

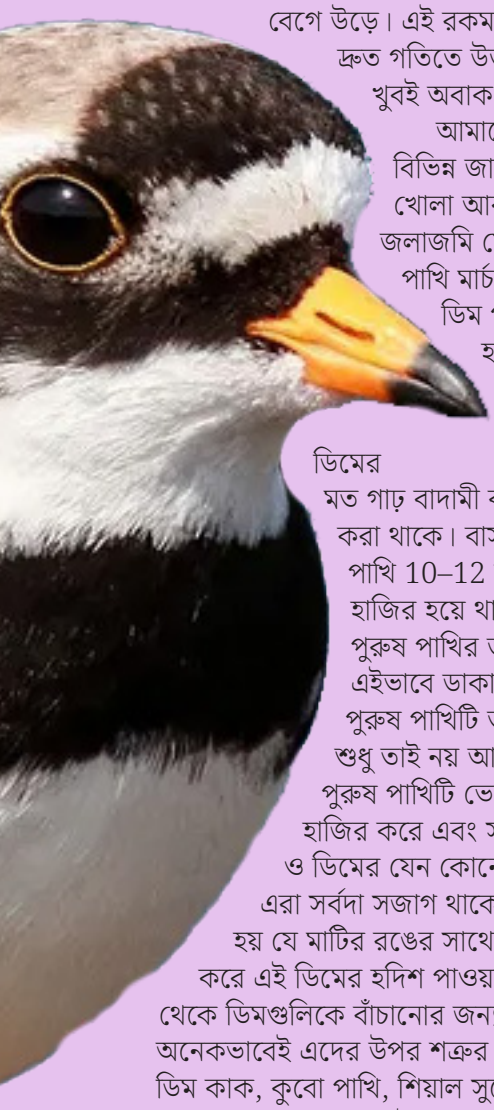

বেগে উড়ে। এই রকম একটি ছোটো পাখির এত দ্রুত গতিতে উড়া দেখলে আমাদের সবাইকে খুবই অবাক করে।

আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন জায়গাতে এরা বিচরন করে। খোলা আকাশের নীচে কাদামাখা জলাজমি যেখানে পায়, সেখানে এই পাখি মার্চ–মে মাসের মধ্যে 2–4 টি ডিম পাড়ে। ডিমগুলো হালকা হলুদ রঙের হয় এবং আকারে কিছুটা লম্বাটে ধরনের হয়ে থাকে। শুধু তাই নয় ডিমের উপর হায়ারোগ্লিফিক লিপির মত গাঢ় বাদামী বর্নের চিত্রকলা মোজায়েক করা থাকে। বাসা বানাবার সময়ে পুরুষ পাখি 10–12 দিন আগে নির্দিষ্ট স্থানে এসে হাজির হয়ে থাকে। এরপর শুরু হয়ে যায় পুরুষ পাখির ডাকডাকি ও হাকডাক এবং এইভাবে ডাকাডাকি করে স্ত্রী পাখিকে পুরুষ পাখিটি তার কাছে নিয়ে চলে আসে। শুধু তাই নয় আগের বারের স্ত্রী সঙ্গীটিকেও পুরুষ পাখিটি ভোলেনা তাকেও ডেকে এনে হাজির করে এবং সবাই মিলে এরা বাসা বানায় ও ডিমের যেন কোনো ক্ষতি না হয় সে বিষয়ে এরা সর্বদা সজাগ থাকে। এদের ডিমের রঙ এমন হয় যে মাটির রঙের সাথে একেবারে মিশে যায় চট করে এই ডিমের হদিশ পাওয়া খুব মুশকিল। শত্রুর হাত থেকে ডিমগুলিকে বাঁচানোর জন্য এটা খুবই কাজে লাগে। অনেকভাবেই এদের উপর শত্রুর আক্রমন হতে পারে। এদের ডিম কাক, কুবো পাখি, শিয়াল সুযোগ পেলে অনেক সময় খেয়ে ফেলে। তবে একটা রক্ষা, মানুষ এই পাখির মাংস খায় না। মনে হয় এই পাখির মাংস সুস্বাদু নয়। শিকারীদের হাত থেকে এদের ডিম গুলিকে রক্ষা করার জন্য এরা বাসা থেকে দূরে এদের দেহকে এমনভাবে নাড়াতে থাকে যে মনে হয় ডিমগুলো যেন ওই অবস্থানেই আছে। শিকরীদের দৃষ্টিভ্রম করার জন্য এরা এরকম পন্থা সব সময়ে অবলম্বন করে থাকে। এদের এরকম বুদ্ধির অবশ্যই আমাদের তারিফ পাওয়ার যোগ্য।

খাবারের সংগ্রহের জন্য এরা কাদাভূমির চারপাশে ঘুরে বেড়ায়, এখান থেকে এই পাখিরা বিভিন্ন পোকামাকড়, কোঁচো, ছোটো কাঁকড়া খাদ্য হিসাবে গ্রহন কর। খাদ্যের প্রয়োজনে এরা সবসময়ের জন্য জলাভূমির বা কাদামাখা জমির কাছাকাছি এরা অবস্থান করতে ভালোবাসে।

অতি আদিমকাল থেকে যদি দেখা যায় তবে দেখা যাবে মানুষের বন্ধু বলতে গাছ ও পাখিই একমাত্র সম্বল ছিলো। গাছ তার সালোক সংশ্লেষের মাধ্যমে অক্সিজেন পরিবেশে ত্যাগ করে মানুষকে

উপহার দিয়েছে এক মুক্ত নির্মল পরিবেশ আর পাখি তার রূপ বৈচিত্রের মাধ্যমে মানুষকে দিয়েছে আনন্দ। আমাদের এই পরিবেশে এই ছোটো জিরিয়া পাখিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তার জন্য আমাদের যেটা করনীয় সেটা করতে হবে।

তবে চারদিকে যেভাবে জলাভূমি বুজিয়ে ফেলা হচ্ছে ও গাছ কাটা পড়ছে তাতে করে সুদূর ভবিষ্যতে এদের দেখা পাওয়া হয়তো মুশকিল হয়ে পড়বে। এদের বেঁচে থাকার জন্য যে রকম পরিবেশের দরকার সেটা বাঁচানো আজ খুবই জরুরী হয়ে পড়েছে। একদিন এমন একটা সময় আসবে যেদিন এদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে। সময় থাকতে থাকতে মনে হয় এই বিষয়ে আমাদের একটু সচেতন হওয়া উচিৎ। ●

*লেখক **শ্রী তাপস কুমার দত্ত** বিজ্ঞান লেখক এবং লোকবিজ্ঞান প্রচারক। ইমেল: tapashkumardutta.2012@gmail.com*

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জগতের মার্চ মাসের কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা

ইউরেনাস আবিষ্কার

1781 সালের 13 মার্চ তারিখে রাতের আকাশে মিথুন রাশির নক্ষত্রমন্ডলী পর্যবেক্ষণ করার সময় জার্মান জ্যোতির্বিদ উইলিয়াম হার্শেল প্রথম একটি ক্ষীণ বস্তু লক্ষ্য করেছিলেন। হার্শেল যদিও একজন সঙ্গীতশিল্পী হিসাবে লন্ডনে কাজ করতেন, তিনি

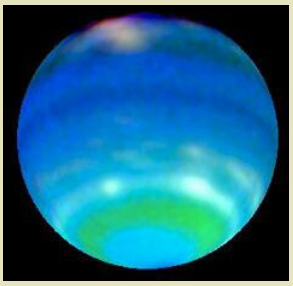

জ্যোতির্বিদ্যার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন এবং নিজেই টেলিস্কোপ তৈরি করে রাতের আকাশ পর্যবেক্ষণ শুরু করেন। বেশ কয়েক রাত ধরে তিনি পর্যবেক্ষণ করেন যে এই জ্যোতিস্কটি রাতের আকাশের তারাদের বিপরীতে ধীর গতিতে সরে যাচ্ছে। প্রাথমিকভাবে এটিকে ধূমকেতু বলে মনে করলেও পরে তিনি সঠিকভাবে একে সূর্যের সপ্তম গ্রহ হিসেবে চিহ্নিত করেন। এর আবিষ্কারক হিসাবে হার্শেল ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় জর্জের সম্মানে নতুন গ্রহের নামকরণ করেন জর্জিয়াম সিডাস। এটি একটি ল্যাটিন নাম যার অর্থ জর্জ তারকা। এই আবিষ্কারের জন্য হার্শেল 1781 সালের নভেম্বরে রয়্যাল সোসাইটির সদস্যপদ এবং বিখ্যাত কোপলি মেডেল অর্জন করে। অন্যান্য দেশের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ব্রিটিশ রাজার নামে নতুন গ্রহের নামকরণ পছন্দ করেননি এবং পরিবর্তে এই গ্রহের নাম রাখা হয় ইউরেনাস। ইউরেনাস নামটি এই কারণেই অনন্য, বাকি গ্রহের রোমান পৌরাণিক নামের মাঝে এটি একমাত্র গ্রীক পৌরাণিক নামে পরিচিত।

প্রথম পর্যায় সারণির প্রকাশ

1869 সালের রুশ ক্যালেন্ডারের 6 মার্চ রাশিয়ান রসায়নবিজ্ঞানী দিমিত্রি মেন্ডেলিভ তাঁর পর্যায় সারণি প্রকাশ করেন। পরবর্তী সময়ে রাশিয়ায় গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার চালু হবার পর দিনটিকে 18 মার্চ ধরা হয়। অজৈব রসায়নের একটি পাঠ্য বই লিখতে গিয়ে

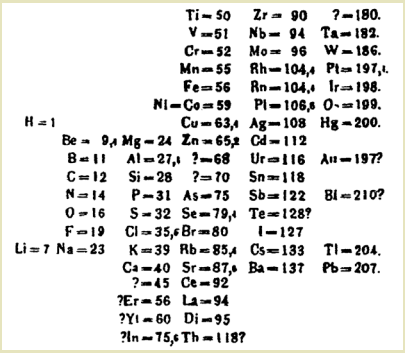

			Ti = 50	Zr = 90	? = 180.		
			V = 51	Nb = 94	Ta = 182.		
			Cr = 52	Mo = 96	W = 186.		
			Mn = 55	Rh = 104,4	Pt = 197,1.		
			Fe = 56	Ru = 104,4	Ir = 198.		
			Ni = Co = 59	Pl = 106,6	O = 199.		
H = 1			Cu = 63,4	Ag = 108	Hg = 200.		
	Be = 9,4	Mg = 24	Zn = 65,2	Cd = 112			
	B = 11	Al = 27,4	? = 68	Ur = 116	Au = 197?		
	C = 12	Si = 28	? = 70	Sn = 118			
	N = 14	P = 31	As = 75	Sb = 122	Bi = 210?		
	O = 16	S = 32	Se = 79,4	Te = 128?			
	F = 19	Cl = 35,5	Br = 80	I = 127			
Li = 7	Na = 23	K = 39	Rb = 85,4	Cs = 133	Tl = 204.		
		Ca = 40	Sr = 87,6	Ba = 137	Pb = 207.		
		? = 45	Ce = 92				
		?Er = 56	La = 94				
		?Yt = 60	Di = 95				
		?In = 75,6	Th = 118?				

মেন্ডেলিভ যখন আবিষ্কৃত মৌলগুলিকে তাদের ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক ভর অনুসারে সাজাচ্ছিলেন, তিনি একটা নির্দিষ্ট অন্তরে মৌলগুলির ধর্মের মধ্যে মিল খুঁজে পান। এই মিলের পেছনে লুকিয়ে থাকা কারণ খুঁজতে তিনি তেরো বছর অতিবাহিত করেন। অবশেষে তিনি মৌলগুলিকে সারণিবদ্ধ করেন। মেন্ডেলিভ বলেছিলেন যে প্রতিটি শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য একটি উপাদান আবিষ্কৃত হবে এবং এমনকি সেই উপাদানগুলির বৈশিষ্ট্যগুলির পূর্বাভাস দেন। এই অনুপস্থিত উপাদানগুলির মধ্যে অন্যতম, গ্যালিয়াম 1875 সালে আবিষ্কৃত হবার পর এর ধর্ম সম্পর্কে মেন্ডেলিভের পূর্বাভাস অনেকাংশে মিলে যায়। যদিও বর্তমানে ব্যবহৃত পর্যায় সারণি তার প্রাথমিক রূপ থেকে কিছুটা পরিবর্তিত, তা সত্ত্বেও পর্যায় সারণির প্রথম রূপদানে মেন্ডেলিভের কৃতিত্ব মৌলদের ধর্ম ও ব্যবহার বোঝার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত। নির্দিষ্ট দিনে মেন্ডেলিভ অসুস্থতার জন্য ব্যক্তিগতভাবে রাশিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির কাছে তাঁর পর্যায় সারণির ধারণা উপস্থাপন করতে পারেন নি। বৈঠকের দিন তাঁর হয়ে এক সহকর্মী এই রিপোর্ট উপস্থাপন করেন।

সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের চূড়ান্ত রূপে প্রকাশ

1916 সালের ২০ মার্চ সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্ব চূড়ান্ত রূপে প্রকাশিত হয়। আলবার্ট আইনস্টাইন 1905 সালে বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব বর্ণনা করেছিলেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী আলোর গতির কাছাকাছি বেগে চলা বস্তুর তন্ত্রে সময়ের হিসেব বদলে

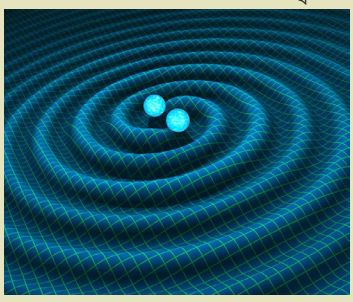

যাবে অর্থৎ সময়ের 'চরম' চরিত্র বজায় থাকবে না। কিন্তু অভিকর্ষ ক্ষেত্র সংক্রান্ত বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর পাওয়া তখনো বাকি ছিল। 10 বছর ধরে সমস্যাগুলি নিয়ে চিন্তা করার পরে, তিনি সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব প্রকাশ করেন। নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্বের বিপ্রতীপে গিয়ে তিনি বলেন মহাকর্ষজ বল প্রকৃতপক্ষে চারমাত্রিক বিশ্বের স্থান-কালের ধারাবাহিক বক্রতার ফল। তাঁর মতে আলো সাধারণত সরলরেখায় ভ্রমণ করে, কিন্তু যদি এটি একটি মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র জুড়ে ভ্রমণ করে তবে তার ওই ক্ষতের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে এবং আলো বক্র পথে যেতে পারে। আলোর এই বক্রতার কারণ হল "ক্ষেত্র"-এর বক্রতা আইনস্টাইনের মতে "সময়"-এর সাথে অবিচ্ছেদ্য, অর্থৎ দেশ ও কাল দুটি বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। সময় এখানে চতুর্থ মাত্রার মত আচরণ করছে। এই বক্রতার কারণ ভরের বিশালতা।

পোলিও ভ্যাকসিনের সাফল্য ঘোষণা

1953 সালের 26শে মার্চ আমেরিকান চিকিৎসা গবেষক ডঃ জোনাস সাল্ক একটি মার্কিন জাতীয় বেতার অনুষ্ঠানে ঘোষণা করেন যে তিনি পোলিওমাইলাইটিসের টিকা সফলভাবে পরীক্ষা করেছেন। এই ভাইরাসটিই পোলিও এবং পঙ্গুত্বের কারণ। পোলিও এমন একটি রোগ যা সভ্যতার ইতিহাস জুড়ে বহুবার মানব সমাজকে প্রভাবিত করেছে। এই রোগে স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হয় এবং রোগী বিভিন্ন মাত্রার পক্ষাঘাতগ্রস্থ হতে পারে। যেহেতু ভাইরাসটি সহজেই ছড়ায়, তাই বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে এই মহামারী ছিল সাধারণ ব্যাপার। সাল্ক যখন নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল বিভাগের ছাত্র ছিলেন, তখন প্রথম ভাইরাস নিয়ে গবেষণা করেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্লু ভ্যাকসিন তৈরিতে সহায়তা করেছিলেন। 1947 সালে তিনি পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণা গবেষণাগারের প্রধান হন এবং 1948 সালে তাকে পোলিও ভাইরাস অধ্যয়ন এবং একটি সম্ভাব্য ভ্যাকসিন বিকাশের জন্য একটি অনুদান প্রদান করা হয়। 1950 সালের মধ্যে তিনি পোলিও ভ্যাকসিনের একটি প্রাথমিক সংস্করণ তৈরী করেন। সাল্কের ভ্যাকসিনের কার্যপদ্ধতিটি ছিল ভাইরাসের বেশ কয়েকটি স্ট্রেনকে মেরে ফেলা এবং তারপর একটি সুস্থ ব্যক্তির রক্তপ্রবাহে সৌম্য ভাইরাসকে প্রবেশ করানো। এর ফলে ব্যক্তির ইমিউন সিস্টেম দেহে অ্যান্টিবডি তৈরি করবে যা ভবিষ্যতে পোলিওমাইলাইটিসের সংক্রমণকে প্রতিহত করতে পারবে। বেতারে ঘোষণার দুই দিন পরে আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের জার্নালে এ সম্পর্কে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। 1954 সালে 13 লক্ষ আমেরিকান স্কুলছাত্রীর উপর সালক ভ্যাকসিনের ক্লিনিকাল ট্রায়াল শুরু হয় এবং 1955 সালের এপ্রিল মাসে ঘোষণা করা হয় যে ভ্যাকসিনটি কার্যকর এবং নিরাপদ।

মেরিনার 10 বুধে পৌছালো

1974 সালের 16ই মার্চ নাসা প্রেরিত মেরিনার 10 প্রথম বুধে পৌঁছায়। 1973 সালের নভেম্বরে এটি যাত্রা শুরু করে। এর গন্তব্য ছিল প্রথমে শুক্র ও তারপর বুধ। মেরিনার 10-এর প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল বুধের বায়ুমণ্ডল (যদি থাকে), পৃষ্ঠতল এবং গঠন বৈশিষ্ট্য অধ্যয়ন করা। পৃথিবীর কক্ষপথ ছেড়ে যাওয়ার পরপরই, মহাকাশযানটি তার প্রথম গন্তব্য শুক্রে যাওয়ার সময় পৃথিবী এবং চাঁদ উভয়েরই আকর্ষণীয় ছবি পাঠায়। ওই বছর জানুয়ারীতে মেরিনার 10 সফলভাবে প্রথমবার C/1973 E1 কোহাউটেক ধূমকেতুর সম্বন্ধে বিশদ তথ্য পৃথিবীতে পাঠায়। 5 ফেব্রুয়ারী থেকে এই মহাকাশযান শুক্রের ছবি পাঠাতে শুরু করে। সামগ্রিকভাবে, মেরিনার 10 শুক্র গ্রহের 4,165টি ছবি ও বহু গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করেছিল। শুক্রের মাধ্যাকর্ষণকে কাজে লাগিয়ে মহাকাশযানটি 16 মার্চ বুধে পৌঁছেছিল। মেরিনার 10 বুধের কাছে আসার সাথে সাথে, যে ছবিগুলি পাঠায় তা থেকে দেখা যায় বুধের পৃষ্ঠ চাঁদের মতো এবং যেখানে গর্ত, পাহাড় এবং অসমান ভূখণ্ড রয়েছে। মেরিনার 10-এর পাঠানো তথ্য থেকে জানা যায় বুধে রাতের তাপমাত্রা মাইনাস 183° C এবং সর্বোচ্চ দিনের তাপমাত্রা 187° C। মেরিনার 10 বুধে বায়ুমণ্ডল বা আয়নোস্ফিয়ারের অভাব সম্পর্কেও জানায়। এর পর মহাকাশযানটি বুধকে পিছনে ফেলে সূর্যের চারপাশে ঘুরতে থাকে এবং পরবর্তী সময়ে আবার বুধে ফিরে আসে। মহাকাশযানটির সাথে সর্বশেষ যোগাযোগ হয়েছিল 1975 সালের 24 মার্চ।

প্রথম মহাজাগতিক আগ্নেয়গিরি আবিষ্কার

1979 সালে বৃহস্পতির সাথে ভয়েজার 1-এর মুখোমুখি হওয়ার পরই 5 মার্চ নেভিগেশন ইঞ্জিনিয়ার লিন্ডা মোরাবিটো মহাকাশযানের গতিপথ নিশ্চিত করার জন্য চিত্রগুলি পরীক্ষা করার সময় একটি সাদা-কালো ছবিতে বৃহস্পতির উপগ্রহ আইও থেকে বেরিয়ে আসা একটি অস্বাভাবিক অর্ধচন্দ্রাকার প্রভা আবিষ্কার করেন। প্রাথমিকভাবে পর্যবেক্ষণ করে বোঝা যায় এটি একটি সক্রিয় আগ্নেয়গিরি। লিন্ডা যা আবিষ্কার করেছিলেন তা ছিল পৃথিবীর বাইরে ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সক্রিয় আগ্নেয়গিরি। পরবর্তীকালে ভয়েজার্স, গ্যালিলিও, ক্যাসিনি, নিউ হরাইজনস এবং জুনো মহাকাশযান থেকে পাওয়া তথ্য পর্যবেক্ষণ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আইও-তে 150 টিরও বেশি সক্রিয় আগ্নেয়গিরির সন্ধান পান। এই পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে 400টি পর্যন্ত এই ধরনের আগ্নেয়গিরির অস্তিত্বের অনুমান করা হচ্ছে। আইও-এর আগ্নেয়গিরির উপস্থিতিতে উপগ্রহটি বর্তমান সৌরজগতের আগ্নেয়গিরিসম্পন্ন বা ক্রায়োভলকানিক ভাবে সক্রিয় পাঁচটি সৌরমন্ডলীয় বস্তুর অন্যতম হিসাবে গণ্য হয়েছে। এই শৃঙ্খলার অন্যগুলি হল পৃথিবী, শনির উপগ্রহ এনসেলাডাস, নেপচুনের উপগ্রহ ট্রাইটন এবং শুক্রগ্রহ।

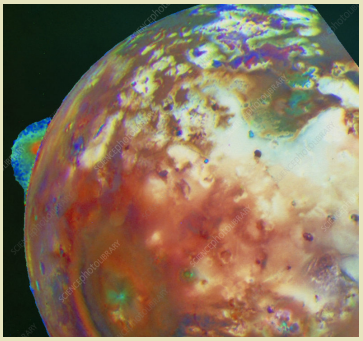

মার্চে জন্মগ্রহণ করেছেন যে বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা

আলেক্সজান্ডার গ্রাহাম বেল

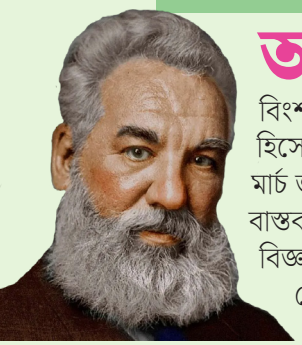

আলেক্সজান্ডার গ্রাহাম বেল আমাদের এক অতি পরিচিত নাম। আজকের মোবাইল ফোনের যুগে তার আবিষ্কৃত এই বিশেষ যন্ত্রটির নাম হয়তো আজ অনেকের কাছেই ল্যান্ডলাইন। কিন্তু উনবিংশ শতকের শেষদিক থেকে পুরো বিংশ শতাব্দী জুড়ে টেলিফোনের গুরুত্ব এতটাই ছিল যে আমরা সকলেই তার নাম মনে রেখেছি টেলিফোনের আবিষ্কর্তা হিসেবে। জন্মসূত্রে স্কটিশ এবং পরবর্তীকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ও কানাডার নাগরিক গ্রাহাম বেলের 1847 সালের তেসরা মার্চ জন্ম হয় এডিনবরা শহরে। 1876 সালে তিনি টেলিফোনের মার্কিন পেটেন্ট লাভ করেন। শোনা যায় যে, টেলিফোন বাস্তবায়িত হওয়ার পরে, তিনি নিজে তার কাজের টেবিলে টেলিফোন রাখতেন না , কারণ, তিনি মনে করতেন যে, তা বিজ্ঞানী হিসেবে তার কাজে মনোসংযোগের ব্যাঘাত ঘটায়। আবিষ্কারক হিসেবে তিনি অবদান রেখেছেন অপ্টিক্যাল টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, উড়ান সংক্রান্ত ক্ষেত্রে বা অ্যারোনটিকসে। মেটাল ডিটেক্টারের একটি প্রাথমিক রূপ দেওয়া এবং আরও কয়েকটি প্রযুক্তির উদ্ভাবনায় তার ছিল উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। ●

জর্জ গ্যামো

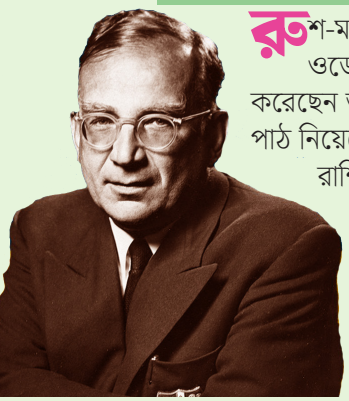

রুশ-মার্কিন তাত্ত্বিক পদার্থবিদ জর্জ গ্যামো আদতে ছিলেন রাশিয়ার মানুষ। তিনি 1904 সালের মার্চ মাসের 4 তারিখে ওডেসাতে জন্মগ্রহণ করেন। এখন এই শহরটি ইউক্রেনের অঙ্গ। অত্যন্ত উজ্জ্বল ছাত্র যখন তার কলেজ জীবনে প্রবেশ করেছেন তখন রাশিয়া এসেছে নতুন শাসকের অধীনে তার নাম হয়েছে সোভিয়েত রাশিয়া। গ্যামো উচ্চতর পদার্থবিদ্যার পাঠ নিয়েছেন লেনিনগ্রাড (এখনকার সেন্ট পিটার্সবার্গ) বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি খুব কম বয়সে পদার্থবিদ হিসেবে সভিয়েত রাশিয়াতে উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতি পেয়েছিলেন, জার্মানির গটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণাকাজ করতে এসে পরিচিত হয়েছিলেন ইওরোপের বেশ কিছু প্রথম সারির পদার্থবিদের সঙ্গে। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ার সেই সময়কার রাজনৈতিক পরিমন্ডল তার কাছে ক্রমশ অস্বস্তিদায়ক হয়ে উঠেছিল। 1930 এর দশকের মাঝামাঝি তিনি সোভিয়েত রাশিয়ার ছেড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসেন। তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার যে শাখাগুলি তাকে আকর্ষণ করে তার মধ্যে রয়েছে কসমোলজি বা সৃষ্টিতত্ত্ব, কোয়ান্টাম বলবিদ্যা, কেন্দ্রকীয় পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি। এবং পদার্থবিদ্যার এই শাখাগুলির প্রত্যেকটিতে তিনি রেখেছেন উল্লেখযোগ্য অবদান। তেজস্ক্রিয় কেন্দ্রক থেকে আলফা কণা নির্গত হওয়ার বিষয়টি তিনি কোয়ান্টাম বলবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেন। ডিএনএ-র গঠন আবিষ্কৃত হওয়ার পরে এই সম্পর্কে গ্যামো একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন এবং তার সেই কাজের মধ্যে দিয়ে উঠে আসা বিষয়টি বায়োলজিক্যাল ডিজেনারেসি (Biological degeneracy) নামে পরিচিত। ●

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

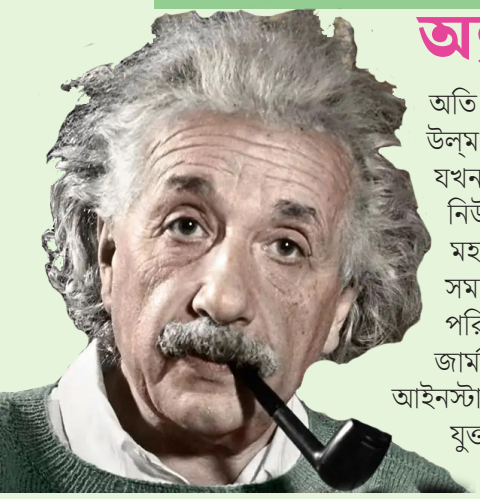

অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের গবেষণাকাজ সম্পর্কে আমাদের অনেকের জ্ঞান সীমিত হলেও মানুষটির নাম ও বিজ্ঞান পরিসরের বাইরে তার বিশেষ ভূমিকার কারণে তিনি কেবল আমাদের সকলের অতি পরিচিত এক ব্যাক্তিত্ব নন, তিনি এক কিংবদন্তী। 1879 সালের চোদ্দই মার্চ তিনি জার্মানির উল্ম শহরে জন্মগ্রহণ করেন। আইনস্টাইন পদার্থবিদ্যার জগতে প্রথম ঝড়টি তোলেন 1905 সালে যখন তার বয়স মাত্র ছাব্বিশ বছর। সময়কে সমস্ত তন্ত্রে অপরিবর্তিত এক ভৌত রাশি ধরে নিয়ে নিউটন বলবিদ্যা গড়ে তুলেছিলেন এবং সর্বত্রই ছিল তার প্রয়োগ। আইনস্টাইন দেখালেন যে মহাশূন্যে আলোর গতিবেগের সমতুল বেগে চলমান বস্তুর ক্ষেত্রে তা ঠিক নয়, কারণ সেই তন্ত্রে সময়ের বহমানতা ভিন্ন হয়ে যাবে। তিনিই প্রথম তাত্ত্বগতভাবে দেখান যে ভর ও শক্তি পরস্পর পরিবর্তনযোগ্য। পরবর্তীকালে তিনি দিয়েছেন আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব। 1920 এর দশক থেকে জার্মানিতে ইহুদী বিদ্বেষ ক্রমাগত মাথা চাড়া দিতে থাকে এবং একজন সচেতন ইহুদী নাগরিক হিসেবে আইনস্টাইন এই মানসিকতার বিরুদ্ধে মতামত রাখেন। শেষ পর্যন্ত 1932 সালে তিনি জার্মানি ছেড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসেন এবং সেখানকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। 1921 সালে তিনি পদার্থবিদ্যায় নোবেল জয় করেন। ●

পিয়ের সাইমন দ্যু ল্যাপ্লাস

ফ্রান্সে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে বেশ কয়েকজন বিশ্বমানের গণিতজ্ঞের জন্ম হয়েছে এবং তাদের অবদানে গণিত কেবল সমৃদ্ধ হয় নি, সুপ্রাচীন বিষয়টি পেয়েছে নতুন দিশা। এদের অন্যতম হচ্ছেন পিয়ের সাইমন দ্যু ল্যাপ্লাস, যিনি 1749 সালে মার্চ মাসের 23 তারিখে ফ্রান্সের নর্মান্ডি অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। ফরাসী নিউটন অভিধায় ভূষিত ল্যাপ্লাস নিউটনের মতই কেবল গণিত নয় পদার্থবিদ্যায় খুব গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাছাড়া সেই সময়কার প্রতিভাবান গণিতজ্ঞের মতই বিচরণ অবাধে করেছেন এবং অবদান রেখেছেন জ্যোর্তিবিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং, রাশিবিজ্ঞান ও পদার্থবিদ্যার মত ক্ষেত্রগুলিতে। পদার্থবিদ্যায় বহুল ব্যবহৃত ল্যাপ্লাস সমীকরণ তার একটি মৌলিক কাজ। তাছাড়া ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম গাণিতীয় পদার্থবিদ্যায় একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদ্ধতি। তিনিই প্রথম সৌরমণ্ডলের স্থায়িত্ব গাণিতিকভাবে প্রমান করেন। তার অনবদ্য দুটি অবদান হ'ল গাণিতিক পরিভাষায় মহাজাগতিক বস্তুর গতি ব্যাখ্যা এবং সম্ভাব্যতা তত্ত্বের উপর তার রচিত দার্শনিক প্রবন্ধ। নেবুলার প্রকল্পের ওপর ভিত্তি করে তিনি সৌরজগতের সৃষ্টি বিষয়ে যে গণনা করেন সেখানে তিনি এখনকার ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণ গহবরের মত একটি ধারণা উপস্থাপিত করেছিলেন। স্টিফেন হকিং এর মতে ল্যাপ্লাসকে কৃষ্ণ গহবরের ধারণার পথিকৃৎ বলা খুব একটা ভুলের নয়। ●

এম্মি নোয়েদার

জার্মান গণিতজ্ঞ এম্মি নোয়েদার 1882 সালের 23 শে মার্চ ব্যাভেরিয়ায় ভূমিষ্ট হন। গণিত ও গাণিতীয় পদার্থবিদ্যায় তার অসাধারণ অবদান তাকে সেরা গণিতজ্ঞদের মধ্যে স্থান দিয়েছে। কিন্তু জার্মানির আরলিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে তার ছাত্রীজীবনের প্রথমাংশে তিনি ভাষা নিয়ে পড়াশুনা করেছিলেন কারণ সেই সময় অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের মত এই বিশ্ববিদ্যালয়েও ছাত্রীদের বিজ্ঞান ও গণিত পাঠের ব্যাপারে ছিল কড়া বিধিনিষেধ। পরবর্তীকালে ডেভিড হিল্বার্ট ও ফেলিক্স ক্লাইনের মত প্রথম শ্রেণির গণিতজ্ঞেরা গটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাকে ছাত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে আগ্রহী হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই সময়কার নিয়ামাবলী তার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তবে শেষ পর্যন্ত 1919 সালে তিনি ঐ গণিত বিভাগে শিক্ষকতা করার জন্য স্বীকৃত হন। ইওরোপে তিনিই প্রথম মহিলা হিসেবে গণিতে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে অধ্যাপনার সুযোগ পান। গণিতের অনেকগুলি বিষয়ে তার মৌলিক অবদান রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম অ্যাবস্ট্রাক্ট আলজেব্রা। নাথান জ্যাকবসনের মতে, অ্যাবস্ট্রাক্ট আলজেব্রার বিকাশ ছিল বিংশ শতাব্দীর গণিতের সবচেয়ে মৌলিক উদ্ভাবনগুলির মধ্যে একটি। পদার্থবিদ্যায় প্রতিসাম্য (symmetry) ও সংরক্ষণ নীতির সম্পর্কটি তিনি তুলে ধরেন তার বিখ্যাত নোয়েদার সমীকরণের মাধ্যমে। একজন সহকর্মীর কথায় তিনি ছিলেন 'সম্পূর্ণরূপে অহংকারহীন ব্যক্তিত্ব, তিনি কখনই নিজের জন্য কিছু দাবি করেননি, সর্বোপরি তার ছাত্রদের কাজের প্রচার করেছেন'। ●

রেনে দেকার্তে

দ্বিমাত্রিক তলে কোন কিছুর অবস্থান নির্দেশ করতে গেলে আমরা পরস্পর লম্ব দুটি সরলরেখার সাহায্য নিই। দুটি রেখার একদিকে X-অক্ষ ও অপরদিকে Y-অক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করে ওই তলে থাকা বিভিন্ন বিন্দুর অনন্য অবস্থান নির্ণয় করতে পারি। এই অক্ষ ব্যবস্থাকে বলা হয় কার্টেজীয় সিস্টেম অব অ্যাক্সেস। এই ধরণাটির উদ্ভাবক হচ্ছেন ফরাসী দার্শনিক রেনে দেকার্তে যার জন্ম হয়েছিল 1596 সালের 31শে মার্চ। বয়সে তিনি গ্যলিলিওর থেকে বয়সে ছোট কিন্তু নিউটনের থেকে বড়। এই প্রেক্ষিতে তার গাণিতিক অবদানগুলিকে বিচার করতে হবে। বস্তুত দর্শনের ক্ষেত্রে দেকার্তের অনেকগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ অবদানের পাশাপাশি তার অত্যন্ত বড় ভূমিকা রয়েছে জ্যামিতি, বীজগণিতকে কাছাকাছি নিয়ে এসে আজকের স্থানাঙ্ক জ্যামিতির ভিত্তি স্থাপনা করা। বস্তুত এখন আমরা জানি যে একদিকে তার দেওয়া অক্ষ ব্যবস্থা জ্ঞান বিজ্ঞানের বহু শাখার বিকাশে সাহায্য করেছে অন্যদিকে তা স্থানাঙ্ক জ্যামিতির সাহায্যে গণিতে এনে দিয়েছে এক নতুন দিশা। তিনি প্রাকৃতিক জগৎকে দেখার জন্য একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেন যা আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তিভূমি। তার মতে জগতে উপস্থিত সকল বস্তু কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং তাদের পরস্পরের মিথস্ক্রিয়া কয়েকটি সার্বজনীন নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ। ●

গ্রন্থ সমালোচনা

গাছপালার গল্পগাথা

গাছপালার গল্পগাথা
লেখকঃ দীপাঞ্জন ঘোষ
ISBN: 978-93-6076-374-9
পৃষ্ঠা: 120 | মূল্য: 419.00

বিজ্ঞান সাধনায় বাঙালি চিরকালই এগিয়ে থাকলেও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার প্রসঙ্গটি বহুদিন ধরেই কিছুটা অবহেলিত। উদ্ভিদবিদ্যা বা প্রাণীবিদ্যার ওপরে হয়তো কোপটা একটু বেশি পড়েছে। উদ্ভিদবিদ্যাকে বাংলায় জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে যে বিশাল শূন্যস্থানটি তৈরি হয়েছে তাতে কিছু অবদান রাখার প্রয়াস শ্রী দীপাঞ্জন ঘোষের এই বিজ্ঞান প্রবন্ধ সংকলন "গাছপালার গল্পগাথা"।

সর্বমোট কুড়িটি প্রবন্ধের মধ্যে লেখকের সুদক্ষ লেখনি সাফল্যের সাথে ফুটিয়ে তুলেছেন আমাদের চেনা অচেনা দেশ বিদেশের বিভিন্ন গাছ পালার বৈচিত্র্যময় সব গল্প। সেদিক থেকে দেখতে গেলে প্রবন্ধগুলির মূল ভাবনা সত্যিই আকর্ষণীয়। প্রতিটি প্রবন্ধই বৈজ্ঞানিক তথ্যে ভরপুর হলেও লেখকের সুচারু দক্ষতায় সেগুলিকে তিনি যত্ন করে গল্পের মোড়কে মুড়ে সাজিয়ে দিয়েছেন, যা নিশ্চিত পাঠকের কৌতূহল জাগিয়ে তুলবে।

গল্প তখনই আকর্ষণীয় হয় যখন তার মধ্যে নতুন ভাবনাকে আকর্ষণীয় ভাবে উপস্থাপন করা হয়। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে কাটাছেঁড়া করলে প্রবন্ধগুলিতে মূলত গাছের ভৌগোলিক বিস্তৃতি, চারিত্রিক বিবরণ, বিশেষ বৈশিষ্ট্য, তাদের বিবিধ ওষধি গুণ এবং ব্যবহারের হদিস পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক কৃষ্ণবটের কথা। এর সবচেয়ে আশ্চর্য অংশটি হলো পাতার নিচের দিকের অদ্ভুত গড়নের খানিকটা টোপরের মত আকৃতি। বর্তমানে এটি দুষ্প্রাপ্য।

মরুভূমির ঊষর প্রান্তরে বেড়ে ওঠা এই বহুবর্ষজীবী 'খেজরি' গাছ কিভাবে বিষ্ণোই জনজাতির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত তার সুন্দর বর্ণনা রয়েছে 'একটি গাছ ও একটি জাতির গল্প' প্রবন্ধটিতে। । এইরকম আরেকটি স্বল্প পরিচিত উদ্ভিদ যা আজও বাংলার লোকজ শিল্পে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা হল শোলাগাছ। লেখক খুবই সহজভাবে গাছটির বৈজ্ঞানিক বিবরণের পাশাপাশি এর ব্যবহার এবং কুটির শিল্পের সম্ভাবনা আমাদের কাছে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। এমনই আরেকটি গাছ 'বনচাঁড়াল' জায়গা করে নিয়েছে 'নাচিয়া ভোলাও তো দেখি' প্রবন্ধে। লাউরো বা বাঁকো নামটি আমাদের কাছে অপরিচিত হলেও পাহাড়ি অঞ্চলে প্রায়ই দেখা মেলে এই বিষধর সাপের মতো ফনা উচিয়ে থাকা এই গুল্মটির। নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সাথে মিশ খাইয়ে বেশ উপভোগ্য করে লেখক পেশ করেছেন এইসব তথ্য তার পাদপে সর্পভ্রম প্রবন্ধে।

একদা পরিচিত উদ্ভিদ হোগলা আজ প্রায় অপরিচিতের তালিকায় চলে গেছে হোগলা পাতা একসময় ঘর ছাউনিতে ব্যবহার হতো যা আমাদের জানা ছিল। ঘর ছাইবার প্রসঙ্গে উঠে আসে আরেকটি অপরিচিত উদ্ভিদ 'চিহড়লতা' বা 'লতাকাঞ্চন' যার সাথে লেখক আমাদের আলাপ করিয়েছেন 'চিহড় পাতার বর্ষাতি' রচনাটিতে।

পৃথিবীর অন্যতম দীর্ঘজীবী উদ্ভিদ হল বাওবাব। এজন্য এরা upside-down tree নামেও খ্যাত। লেখক এক দীর্ঘ প্রবন্ধে বাওবাবকে কল্পতরু বৃক্ষ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সঙ্গে রয়েছে গাছটিকে ঘিরে প্রচলিত আকর্ষণীয় কিছু কিংবদন্তি।

এছাড়াও রয়েছে এমন কিছু প্রবন্ধ যা পাঠককে সচেতন করে নানা রকম উদ্ভিজ্জ পণ্যের প্রতি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় 'রসনা তৃপ্তিতে গাছের ফুল' প্রবন্ধটির কথা। অথবা ধরা যাক 'গাছ থেকে ডিজেল' প্রবন্ধটির কথা, যেখানে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে গাছ থেকে তৈরি বায়োডিজেল সত্যিই কতটা উপকারী হতে পারে।

এছাড়াও লেখক তুলে ধরেছেন উদ্ভিদবিজ্ঞান চর্চার ঐতিহ্যগত ও আধুনিক কিছু পদ্ধতি এবং তার সাথে জড়িত সাম্প্রতিক প্রগতির গল্প তার 'উদ্ভিদের স্নায়ুতন্ত্র এবং তারপর' আর 'বয়সের বারকোড' প্রবন্ধ দুটিতে। একইভাবে আরো কিছু উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে বইটিতে, যেমন 'গাছের মধুশালা', 'বৈচিত্র ভরা বেত' ও 'স্বল্প দিনের অতিথি লটকন'।

বইটির বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল ছবি ও অলংকরণ, এরকম রঙিন ছবিতে ভরা গাছপালার ওপর বাংলা ভাষায় কোন বই এর আগে আমার চোখে পড়েনি। অলংকরণ, ছবি তোলা, সংগ্রহ, নির্বাচন ও শেষ পর্যন্ত দুই মলাটের ভেতর সবকিছু একত্রিত করার এই সার্থক প্রচেষ্টাকে জানাই সাধুবাদ। উদ্ভিদ সম্পর্কে উৎসাহী পাঠকের কাছে এই বইয়ের গুরুত্ব অপরিসীম কিন্তু সাধারণ পাঠকের কথা ভাবলে হয়তো কিছু প্রবন্ধ তথ্যের গুরুভার মুক্ত এবং নাতিদীর্ঘ হবার দাবি রাখে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস পাঠক সমাজে এই বইটি সমাদৃত হবে।

অদীনপুণ্য মিত্র *(adinpunya@gmail.com)* ও ***লোপামুদ্রা বল্লভ***
ভারতীয় প্রযুক্তিবিদ্যা প্রতিষ্ঠান, খড়্গপুর

লেখকদের জন্য: বাংলা বিজ্ঞান কথায় অনধিক 1200 শব্দের মধ্যে বাংলায় লোকবিজ্ঞান প্রবন্ধ, বিজ্ঞানের গল্প, কল্পবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে লেখা পাঠানোর জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। হাতে লেখা বা ইউনিকোড ফন্টে টাইপ করা পাণ্ডুলিপি এবং পৃথকভাবে লেখা সংক্রান্ত ছবি পাঠানোর জন্য Bangla Bigyan Katha, Shanti Foundation, UG 17, Jyoti Shikhar, District Centre, Janakpuri, New Delhi 110060 ঠিকানায় চিঠি পাঠান বা ইমেল করুন: amitesh@sunpublish.com. প্রতিটি লেখার শেষে অবশ্যই লেখক পরিচিতি ও লেখকের ইমেল উল্লেখ করুন।